ক্লদ লেভি-স্ত্রস

মিথ এন্ড মিনিং

হাজার হাজার বছর ধরে মানবসমাজের বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনশীলতার মূলে ছিল মিথ। সতের শতকে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রসার ঘটলে ও উপনিবেশিকতার সূত্রে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লে মানুষের চিন্তাজগতে মিথের এই ভূমিকার প্রায় অবসান ঘটে। বিশ শতকে নৃতত্ত্ববিদ্যার বিকাশের সাথে সাথে মানব-ইতিহাসে মিথের ভূমিকার ব্যাপকতা নতুন করে অনুধাবন শুরু হয়। যে সব সমাজতাত্ত্বিক এ বিষয়ে পথিকৃৎ ক্লদ লেভি-স্ত্রস তাঁদের অন্যতম।

মিথ এন্ড মিনিং

মিথ এন্ড মিনিং

ক্লদ লেভি-স্ত্রস

প্রিসিলা রাজ অনূদিত

BANGLAYAN
বাঙলায়ন

ISBN 984 835 023 3

মিথ এন্ড মিনিং	মূল : ক্লদ লেভি-স্ত্রস
	অনুবাদ : প্রিসিলা রাজ
প্রকাশক	বাঙলায়ন
	অস্ট্রিক আর্যু কর্তৃক প্রকাশিত ও
	শফিক মনজু কর্তৃক মুদ্রিত
	রুমি মার্কেট ৬৯ প্যারিদাস রোড
	বাঙলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দ্বিতীয় সংস্করণ	ফাল্গুন ১৪১৩, ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ	মাঘ ১৪০৮, ফেব্রুয়ারি ২০০২
বর্ণবিন্যাস	টোটেম এডুকেশন

Myth & Meaning	by Claude Levi-Strauss
Translated into Bangla	by Priscilla Raj
Published by	Austric Aarju & Printed by Shafiq Monju
	on behalf of BANGLAYAN
Second Edition	Falgoon 1413, February 2007
First Published	Magh 1408, February 2002
Correspondence	BANGLAYAN
	68-69 Pyaridas Road, Banglabazar
	Dhaka 1100
Phone	7112980, 01199114737, 01815001752
e-mail	banglayan_books@yahoo.com

মূল্য	৭৫.০০ টাকা
Price	Tk. 75.00 US $ 3

অনুবাদকের উৎসর্গ

আব্বাকে

মিথ সংক্রান্ত বাঙলায়নের অন্যান্য বই

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পুরাণের দেবী / শফিক মনজু
মিথের নারী মিথের পুরুষ / অস্ট্রিক আর্যু

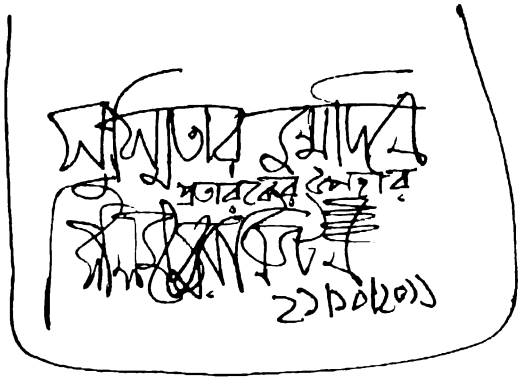

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ১১

ভূমিকা ১৫

১৯৭৭ সালের ম্যাসি বক্তৃতামালা ১৭

মুখোমুখি মিথ ও বিজ্ঞান ২১

'আদিম' চিন্তা 'সভ্য' মন ২৯

কাটাঠোঁট আর যমজের গল্প : একটি মিথের ব্যবচ্ছেদ ৩৭

মিথ যখন ইতিহাস হয়ে ওঠে ৪৪

মিথ ও সঙ্গীত ৫২

ক্লদ লেভি-স্ত্রসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৬৩

অনুবাদকের কথা

১

মহান ফরাসী নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভি-স্ত্রসের কথা প্রথম কোথায় পড়েছিলাম মনে নেই। তবে বিভিন্ন রচনায় তাঁর সম্পর্কে পড়ে যে ধারণা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে এই মনীষী ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে বিকশিত নৃতত্ত্বকে এর ঔপনিবেশিক চরিত্র থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিলেন।

নৃতত্ত্বের বিকশিত হওয়ার ধারাবাহিকতাকে যদি ভুল না বুঝে থাকি তবে বলতে হয় যে সমাজবিজ্ঞানের এই শাখাটি বিকশিত হওয়ার ভিত্তি তৈরি হতে শুরু করে ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা অন্যান্য মহাদেশে পাড়ি জমানোর পর। আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশের নানা জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসতে শুরু করেন তাঁরা। এর ফলে একদিকে যেমন উপনিবেশ স্থাপন চলল তেমনি অন্যদিকে এসব জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজও চলতে লাগল। তথ্য সংগ্রহের পেছনে এসব জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য যেমন ছিল তেমনি অনেকের মধ্যে ভিন্ন সংস্কৃতিকে জানার জ্ঞানস্পৃহাও কাজ করেছিল।

মানব-ইতিহাসের প্রথম দিকে মানুষের সমাজের গঠন কীরকম ছিল, কোন কোন শর্তের আওতায় কীভাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আবর্তিত হত, আত্মীয়তার বন্ধন, প্রথা, সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ওপর গবেষণাকে কেন্দ্র করে নৃতত্ত্ব বিকশিত হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে অন্যান্য বিদ্যার মতই এরও আওতা বেড়েছে। এখন নৃতত্ত্ব তথাকথিত আদিম সমাজ শুধু না, কাজ করছে তথাকথিত আধুনিক সমাজের বহু দিকের ওপর। এর দিগন্ত অনেক প্রসারিত হয়েছে।

২

ক্লদ লেভি-স্ত্রস জন্ম নেন ১৯০৮ সালে বেলজিয়ামে। (বইয়ের শেষে লেভি-স্ত্রসের সংক্ষিপ্ত জীবনী যুক্ত করা হল।) তিনি পড়ালেখা করেছেন দর্শন ও আইন শাস্ত্রে। সেসময় আলাদা বিষয় হিসাবে নৃতত্ত্ব পড়ানো শুরু হয়নি। খুব সম্ভবত তাঁর হাত ধরেই ফরাসী দেশে নৃতত্ত্ব আলাদা পাঠ্য বিষয়ের মর্যাদা লাভ করে।

কাঠামোবাদ প্রয়োগ করে পৃথিবীর তথাকথিত আদিম সমাজগুলোর সামাজিক সংগঠন ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত নানান মিথের নতুন ও বহুমুখী বিশ্লেষণ লেভি-স্ত্রসের প্রভাব কেবলমাত্র নৃতত্ত্বে সীমিত না রেখে সাহিত্য থেকে শুরু করে শিল্প ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রসারিত করেছে। লেভি-স্ত্রস মূলত ফরাসীতে লিখেছেন। তবে এখানে যে বক্তৃতামালা অনুবাদ করা হয়েছে সেগুলো তিনি ইংরেজীতেই দিয়েছিলেন।

এই বক্তৃতাগুলোর বাইরে লেভি-স্ত্রসের বড় কোনো লেখা আমার এখনো পড়া হয়ে ওঠেনি। তবে যতটুকু পড়েছি তাতে তাঁর লেখা বেশ দুরুহ লেগেছে। এর একটি কারণ সম্ভবত এই যে তিনি এক বিষয়ের সাথে অনেক দূরবর্তী আরেক বিষয়ের তুলনা করেন যে ধরনের তুলনার জন্য পাঠক খুব একটা প্রস্তুত থাকে না। এই ক্ষেত্রে তাঁর অসীম ক্ষমতা আমাকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছে যার বেশ কিছু নমুনা পাঠক এই বক্তৃতাগুলোতেও পাবেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কম্পিউটার যে বাইনারি পদ্ধতিতে কাজ করে সেই একই ধারণা স্কেট মাছ ও দখিনা হাওয়া নিয়ে একটা মিথে কীভাবে কাজ করেছে লেভি-স্ত্রস তার ব্যাখা দিয়েছেন (দ্বিতীয় অধ্যায়)। কোথায় বাইনারি আর কোথায় দখিনা হাওয়া! ভাষা আরেকটা কারণ হতে পারে। তাঁর মূল লেখা ফরাসীতে হওয়ায় আমরা তার ইংরেজী অনুবাদ পড়ে থাকি। হতে পারে আমি যে গুটিকয়েক লেখা পড়েছি তার অনুবাদের ভাষা সহজবোধ্য ছিল না।

এই অনুবাদটি পড়ার সময় পাঠককে একটা বিষয় মনে রাখতে অনুরোধ করব। সেটা হল এটি রেডিও আলাপচারিতার লিখিত রূপ। মূল ইংরেজী পড়লে এর কথা বলা চরিত্রটি আরো বেশি করে ধরা যায়। বাংলা অনুবাদেও এই কথ্য চরিত্রটি ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে লেখায় উত্থাপিত

প্রসঙ্গের যে ধারাবাহিকতা থাকে তা এখানে মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হতে পারে। বাংলা অনুবাদটির আরেক দুর্বলতা হয়ত এর সঠিক পরিভাষা প্রয়োগের অভাব। হাতের কাছে নৃতত্ত্বের বাংলা পরিভাষাকোষ জাতীয় কোনো বই না থাকায় পরিভাষার ব্যাপারে সাধারণ অভিধান ও নিজের বিবেচনার ওপর নির্ভর করেছি। কিছুদিন আগে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত সাদাত উল্লাহ খানের নৃবিজ্ঞান পরিভাষা কোষ চোখে পড়েছে। তবে সময়াভাবে তা আলোচনা করা গেল না।

প্রতিটি অধ্যায় শেষে একটি ছোট্ট অংশ রয়েছে। এখানে কয়েকটি জিনিস দেওয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে মূল ইংরেজীতে ব্যবহৃত কিছু শব্দের ইংরেজী বানান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল ইংরেজী ও এর যে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে তা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ 'মিথ ও সঙ্গীত' অধ্যায়টি পাঠকের কাছে হয়ত সবচেয়ে দুরুহ এমনকি অদরকারি মনে হতে পারে। এর কারণ পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের সাথে লেখক মিথের কাঠামোর যে তুলনা করেছেন সেটা বাংলাভাষী এবং পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতে সচরাচর খুব কম জ্ঞান রাখেন এমন পাঠকের পক্ষে বোঝা দুরুহ হবে সন্দেহ নেই। আমার নিজেরও এই অধ্যায়টি অনুবাদ করতে খুব বেগ পেতে হয়েছে। অধ্যায়টির শেষে আমি সেখানে উল্লিখিত সঙ্গীতের বিভিন্ন প্রকারভেদের সংজ্ঞা দিয়েছি। পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত শুধু না, সঙ্গীত সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ হওয়ায় এ ধরনের সঙ্গীতের বিভিন্ন ধরন বাংলায় অনুবাদ করার ঝুঁকি নেইনি, সরাসরি ইংরেজীটাই তুলে দিয়েছি। জানি না এতে পাঠকের কোনো উপকার হবে কিনা। এখানে একটি আশাবাদ ব্যক্ত করি, যদি এই ছোট্ট বইটা পরবর্তী সংস্করণের মুখ দেখে তখন পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের ওপর একটি ছোট্ট লেখা যোগ করার ইচ্ছা আছে। আশা করি ততদিনে সঙ্গীত সম্পর্কে একটুখানি জানা হবে।

এই বক্তৃতামালার সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ এর আগে খুব সম্ভবত হয়নি। তবে কয়েক মাস আগে দৈনিক 'প্রথম আলো'র সাময়িকীতে একটি অধ্যায়ের অনুবাদ চোখে পড়েছিল। তাৎক্ষণিক জিঘাংসা বলে উপভোগ্য সেই লেখাটির অনুবাদক বা অধ্যায়টির শিরোনাম কোনোটাই মনে রাখা হয়নি।

৩

এটি একটি সম্পূর্ণ বন্ধু প্রযোজনা। প্রথমেই গাজী মাহতাব হাসান। লেভি-স্ত্রসের একটি বক্তৃতা অনুবাদ করতে দেখে সে-ই প্রথম বুদ্ধি দেয় সব বক্তৃতাগুলোর অনুবাদ মলাটবন্দী করার। ছবি নির্মাতা ও সম্পাদক প্রিয় বন্ধু ফৌজিয়া খান অনুবাদগুলোর প্রুফ দেখে দিয়েছে ও ভাষা বিষয়ে অনেক পরামর্শ রেখেছে। সময়াভাবে সেই পরামর্শ সবগুলো কাজে লাগানো গেল না। শফিক শাহীন অপূর্ব প্রচ্ছদটি করে দিয়েছে। আর আমাদের আরেক বন্ধু তরুণ প্রকাশক অস্ট্রিক আর্যু এটা প্রকাশ করছে। আমরা এতগুলো বন্ধু মিলে এই দুষ্কর্ম করতে পারছি–এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না।

আমার আম্মা, বোন ও শারমিনের কথা না হয় না-ই বললাম।

প্রিসিলা রাজ
জানুয়ারি ১০, ২০০২

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

আগের সংস্করণে বলেছিলাম যে এ বইটির পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ আগে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বইটি প্রকাশ হওয়ার অনেক দিন পর নূরুল আলম আতিক সম্পাদিত 'নৃ' পত্রিকার একটি সংখ্যায় আমি বইটির পুরো অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে দেখতে পাই। অনুবাদ করেছিলেন সামসুদ্দিন চৌধুরী। এই সংস্করণে অধ্যায়ের শেষে যুক্ত ছোট্ট অংশটিকে টীকা বলেছি যা আগের সংস্করণে ছিল 'নোট' – এই নামে।

প্রিসিলা রাজ
ডিসেম্বর ১০, ২০০৬

ভূমিকা

আমাকে এখানে আমার লেখালেখি সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। দুঃখের বিষয় একবার লেখা শেষ হয়ে গেলে কী লিখলাম একদম ভুলে যাই। ফলে আমার আলাপচারিতায় কিছুটা সমস্যা হতে পারে। তবে এর তাৎপর্যের দিকটা হল যখন লিখি তখন আমিই যে লিখছি সেই বোধটা থাকে না। লেখালেখির ব্যাপারে আমার অনুভূতিটা হচ্ছে লেখাটা আমাকে দিয়ে কীভাবে যেন হয়ে যাচ্ছে। আর একবার লেখা হয়ে গেলে আমার ভেতরটা পুরোপুরি খালি হয়ে যায়।

আপনাদের হয়ত মনে আছে আমি বলেছিলাম যে মিথ মানুষের মধ্যে তার অজান্তেই জন্ম নিয়েছে। আমার এই মন্তব্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে এবং আমার অনেক ইংরেজীভাষী সহকর্মী এর কড়া সমালোচনাও করেছেন। কারণ তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার এই মন্তব্য একান্তই অর্থহীন। কিন্তু আমার নিজের কাছে এ আমার যাপিত অভিজ্ঞতারই প্রকাশ।। এর মধ্যে দিয়ে আমি নিজের সাথে আমার কাজের সম্পর্কের ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। আর সেটা হল লেখার ব্যাপারটা নিজের অজান্তেই আমার দ্বারা হয়ে যায়।

আমার চেতনায় কখনোই আত্মপরিচয় অনুভবের ব্যাপারটা ছিল না।। নিজেকে আমার একটা স্থান বিশেষ বলে মনে হয় যেখানে কিছু প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে, যেখানে 'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই। আমরা সকলেই যেন এক একটি জংশন যেখানে ঘটনা ঘটে। জংশন নিজে কিছু করে না, সেখানে ঘটনা ঘটে চলে। আবার অন্য জংশনে একইভাবে অন্য ঘটনা ঘটে। এখানে পছন্দ বলে কোনো বিষয় নেই, পুরোটাই দৈবঘটিত।

অবশ্য এটাও আমার একেবারে দাবি করা উচিত না যে আমি এভাবে ভাবি বলে দুনিয়ার আর সকলকে সেভাবেই ভাবতে হবে। তবে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি বা লেখক যা চিন্তা করেন বা যা লেখেন তা মানবজাতির জন্য চিন্তার এক একটা জানালা খুলে দেয় বলে আমি বিশ্বাস করি। আমার নিজস্ব চিন্তা-পদ্ধতি যেমন ঠিক হতে পারে তেমনি আমার সহকর্মীরা যে পথে ভাবছেন ও দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করছেন সেটাও কোনো অংশে কম সঠিক না।

১৯৭৭ সালের ম্যাসি বক্তৃতামালা

সতের শতকে যখন থেকে বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে তখন থেকে আমরা মিথলজিকে কুসংস্কারগ্রস্ত ও আদিম মানসের ফসল হিসাবে উপেক্ষা করে আসছি। অতি সাম্প্রতিককালেই কেবলমাত্র আমরা মিথের প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাসে এর ভূমিকার ব্যাপকতা সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়ন করতে শুরু করেছি। স্বনামখ্যাত সমাজ নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভি-স্ত্রস মিথ বিশ্লেষণ ও মানুষের সামগ্রিক অবধারণে মিথের তাৎপর্য আবিষ্কারে সারাজীবন ব্যাপৃত থেকেছেন। এখানে সংকলিত পাঁচটি বক্তৃতায় লেভি-স্ত্রস তাঁর আজীবন সাধনায় লব্ধ অন্ত দৃষ্টি মেলে ধরেছেন।

"মিথ এন্ড মিনিং" নামে তাঁর এই বক্তৃতামালা ১৯৭৭-এর ডিসেম্বরে সিবিসি রেডিওর 'আইডিয়াস' শীর্ষক সিরিজে প্রচারিত হয়। এই বক্তৃতাগুলো সঙ্কলিত হয়েছিল প্রফেসর লেভি-স্ত্রস-এর সাথে সিবিসি রেডিও-র প্যারিস ব্যুরোর প্রযোজক ক্যারোল অর জেরোমের দীর্ঘ আলাপচারিতা থেকে।। সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন জেরালডাইন শারম্যান, 'আইডিয়াস'-এর নির্বাহী প্রযোজক ও প্রযোজনা করেছেন বার্নি লুখ্‌ট।

প্রকাশনার সময় বক্তৃতাগুলোকে আরো কিছু উপাদান সংযোজিত হয়েছে যা সময়াভাবে রেডিওতে প্রচারিত আলাপচারিতায় নিয়ে আসা যায়নি।। প্রকাশনার উপযোগী করতে গিয়ে এই কথোপকথনে যৎসামান্য সম্পাদনা করা হয়েছে। নীচে লেভি-স্ত্রসকে করা ক্যারোল ওর জেরোমের মূল প্রশ্নাবলি যুক্ত করা হল।

প্রথম অধ্যায়

আপনার বহু পাঠকই মনে করেন আপনি আমাদেরকে মিথভিত্তিক চিন্তার জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। এর কারণ আপনার মতে মানুষ মিথের জগৎ থেকে সরে গিয়ে অমূল্য কিছু হারিয়েছে যা তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন, এর অর্থ কি এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিন্তা পরিত্যাগ করে মিথীয় চিন্তার জগতে ফিরে যাওয়া আমাদের অবশ্যকর্তব্য?

কাঠামোবাদ কী? কাঠামোবাদী চিন্তা যে একটা সম্ভাব্য আইডিয়া এই সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছালেন কী করে ?

অর্থের জন্য শৃঙ্খলা ও নিয়ম কি অপরিহার্য? বিশৃঙ্খলার মধ্যে কি অর্থ উৎপন্ন হতে পারে? বিশৃঙ্খলার চেয়ে শৃঙ্খলা উত্তম - এ দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়

বহু মানুষ আছে যারা মনে করে তথাকথিত আদিম মানুষের চিন্তার ধরন বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরন থেকে নিম্নমানের। তারা মনে করে এ জাতীয় চিন্তা যে নিম্নমানের তা এর ধরনের জন্য না বরং এই কারণে যে এটা ভুল চিন্তা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি 'আদিম' চিন্তা ও 'বৈজ্ঞানিক' চিন্তার মধ্যে কীভাবে তুলনা করবেন?

এলডাস হাক্সলি তাঁর *দ্য ডোরস অব পারসেপশন* বইয়ে লিখেছেন যে, আমরা আমাদের মানসিক সামর্থ্যের খুব কম অংশই ব্যবহার করি; বাকিটা অব্যবহৃত পড়ে থাকে। আপনার কি মনে হয় যারা মিথীয় ধরনে চিন্তা করে বলে আপনি বলছেন তাদের চেয়ে আমরা কম মানসিক ক্ষমতা ব্যবহার করছি?

চতুর্থ অধ্যায়

নিজেদের মিথলজির সংগ্রহের দিকে তাকিয়ে যে প্রশ্ন আমাদের মনে উঁকি দেয় তা হচ্ছে, এসব গল্পের কি নিজস্ব অর্থ ও ধারাবাহিকতার শৃঙ্খলা আছে? নাকি যে ধারাবাহিকতা এখন আমরা লক্ষ্য করি তা সংগ্রাহক নৃতাত্ত্বিকরা পরবর্তীকালে এদের ওপর আরোপ করেছেন?

মিথীয় পদ্ধতিতে চিন্তার শৃঙ্খলা ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে চিন্তার শৃঙ্খলার মধ্যে তফাৎ কী? মিথে বর্ণিত গল্প কি ঐতিহাসিক তথ্যকে ঘিরে তৈরী হয় যেগুলো পরে রূপান্তরিত হয়ে অন্য চেহারা নেয়?

পঞ্চম অধ্যায়

মিথ ও সঙ্গীতের সম্পর্কের ওপর সাধারণভাবে কিছু বলুন।

আপনি বলেছেন যে মিথ ও সঙ্গীত দু'টিরই জন্ম ভাষা থেকে কিন্তু এদের বিকাশ ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন পথে। এ দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

প্রথম অধ্যায়

মুখোমুখি মিথ ও বিজ্ঞান

একটা ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু করছি। সায়েন্টিফিক আমেরিকান নামের বিজ্ঞান সাময়িকীটি আমি আগাগোড়া খুঁটিয়ে পড়ে থাকি। সবটা যে বুঝি তা না তবে আধুনিক বিজ্ঞানে যা ঘটে চলেছে সেটা জানতে আমি যাকে বলে প্রচণ্ড আগ্রহী। ফলে বিজ্ঞানের নিরিখে আমার অবস্থানকে নেতিবাচক বলা চলে না।

দ্বিতীয়ত, কিছু জিনিস আছে যেগুলোকে আমরা ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছি, সেগুলোকে মনে হয় আমাদের আবার উদ্ধার করা দরকার। মুশকিল হল আমরা যে দুনিয়ায় ইদানিং বাস করছি তাতে করে এসব হারানো অস্তিত্বের পুরোপুরি উদ্ধার (এমনভাবে যেন এগুলো কোনোকালেই হারায়নি) আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে আমরা এই হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব উপলব্ধির চেষ্টাটুকু অন্তত করতে পারি।

তৃতীয়ত, আমার কখনোই মনে হয়নি আধুনিক বিজ্ঞান এই হারানো জিনিসগুলো থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। বরং মনে হয় আধুনিক বিজ্ঞান আরো বেশী করেই যেন চেষ্টা করছে হারানো জিনিসগুলোকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে খাপ খাওয়াতে। বিজ্ঞান এবং যাকে মিথীয় চিন্তা বলা যেতে পারে (অভিধাটা পুরোপুরি ঠিক হল না, আসলে চিন্তার ধরনটা কেমন তা বোঝাতেই এই নাম দেওয়া), এই দুইয়ের মধ্যে ফাঁকটা শুরু হয়েছিল সতের ও আঠার শতকে। সে সময় নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরেই বেকন, দেকার্তে, নিউটন ও আরো অনেকের সাথে মিলে বিজ্ঞান পুরাতন মিথীয় ও রহস্যবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া সে সময় এটাও ভাবা হত যে বিজ্ঞানের পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের দিকে পিঠ ফিরিয়েই কেবলমাত্র বেঁচে থাকা সম্ভব।

ভাবা হতো চক্ষু, কর্ণ আর স্বাদের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দুনিয়া আমাদের প্রকৃত জগৎ থেকে দূরে নিয়ে যায়। আর সে সময় গণিতের জগৎকেই প্রকৃত জগৎ বলে ভাবা হতো: অংকের ভাষাতেই সে জগতের খোঁজ পাওয়া সম্ভব যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের একেবারে বিপরীত। তবে এই বিচ্ছেদ মনে হয় দরকারও ছিল। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি এই বিচ্ছেদের কল্যাণেই (বিচ্ছেদের কল্যাণে - কথাটা আপনাদের পছন্দ হল তো?) বৈজ্ঞানিক চিন্তা নিজেকে দাঁড় করাতে পেরেছিল।

এখন আমার ধারণাটা হল (অতি অবশ্যই আমি বিজ্ঞানী নই, নই পদার্থবিদ, জীববিজ্ঞানী বা রসায়নবিদ) সমসাময়িক বিজ্ঞান এই ফাঁক পূরণে নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আরো বেশী করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য বিজ্ঞানে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যকে গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে, এটা এখন এমন কিছু যার অর্থ আছে, আছে একটি নিজস্ব সত্য যার ব্যাখ্যা সম্ভব।

উদাহরণ হিসাবে গন্ধের জগৎটাকেই ধরা যাক। আমাদের একসময় ধারণা ছিল গন্ধের জগৎটা একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যার যার নিজের এবং বৈজ্ঞানিক জগৎ বহির্ভূত। কিন্তু এখন রসায়নবিদরা আমাদের জানাচ্ছেন যে প্রত্যেক গন্ধ বা স্বাদের একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক ধাঁচ আছে। সে কারণেই অনেক গন্ধ ও স্বাদ আমাদের কাছে একই চেহারা নিয়ে দেখা দেয় আবার অনেকগুলো একেবারেই আলাদা মনে হয়।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। গ্রীকদের সময় থেকে শুরু করে আঠার এমন কি উনিশ শতক পর্যন্ত অংকের বিভিন্ন ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে একটা জোর বির্তক ছিল। রেখার ধারণা, বৃত্ত বা ত্রিভুজের ধারণা মানুষের মধ্যে কী করে এল তাই নিয়ে এই বিতর্ক। সাধারণত দু'টি তত্ত্বের মধ্যে তর্কটা চলত: প্রথমটা হল মস্তিষ্ককে একটা ফাঁকা গোলক বলে ধরা হত, সেখানে শুরুতে কিছু থাকে না; অভিজ্ঞতা থেকেই এখানে যা কিছু সঞ্চারিত হয়। চারপাশে অনেক গোলাকৃতি বস্তু দেখতে দেখতে যেটার আবার কোনোটাই নিখুঁত গোল না, মানুষের মাথায় বৃত্তের আইডিয়া আসে। দ্বিতীয় ধ্রুপদী আইডিয়াটি প্লেটোর দান। তিনি বলেছিলেন আমাদের মস্তিস্কে সরলরেখা, ত্রিভুজ বা বৃত্ত ইত্যাদির ধারণা দেওয়া আছে। মাথায় আছে বলেই আমরা যাকে বাস্তব জগৎ বলে, সেখানে এই ধারণাগুলোকে প্রক্ষেপ করতে পারি যদিও আমাদের চারপাশে নিখুঁত সরলরেখা, বৃত্ত বা ত্রিভুজ ইত্যাদি কিছু নেই।

কিন্তু আজকের স্নায়ুশারীরবিজ্ঞানে দৃষ্টিশক্তির ওপর যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁরা জানিয়েছেন রেটিনার স্নায়ুকোষ এবং রেটিনার পেছনের প্রত্যঙ্গগুলো এক একটি কাজে পারদর্শী। কিছু কোষ আছে যারা শুধু উল্লম্ব রেখায় সরলরেখা দেখতে পায়; কতগুলো কোষ শুধু আনুভূমিক রেখায় সরলরেখা দেখতে সক্ষম; কিছু আবার তীর্যক রেখায় সরলরেখা দেখে; অন্যগুলো পেছনের পটভূমি ও কেন্দ্রর বস্তুর সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে ইত্যাদি। আদতে বেশ জটিল এই ব্যাপারটি ব্যাখা করার মত যথেষ্ট ইংরেজী আমার জানা নেই, তাই এত সহজ করে বললাম। যাই হোক, অভিজ্ঞতা বনাম মস্তিস্ক বিতর্কের একটা সন্তোষজনক সমাধান স্নায়ুতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে পাওয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ মস্তিষ্কও নয়, আবার অভিজ্ঞতাও নয় – এই বিতর্কের সমাধান পাওয়া গেছে এই দুইয়ের মাঝখানে – স্নায়ুতন্ত্রের গড়ে ওঠা এবং স্নায়ুতন্ত্র যেভাবে মস্তিষ্ক এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে সেতুর মত কাজ করছে সেখানে।

সম্ভবত আমার মস্তিষ্কের গভীরে এমন কিছু আছে যেটা আমার চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্য তৈরী করেছে। এর ফলে কাঠামোবাদী বলে আজ আমার যে পরিচয় সেটা আসলে শৈশব থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। আমার মা বলতেন আমি যখন দুই বছরের এবং বলা বাহুল্য পড়তেই শিখিনি, তখনই পড়তে পারি বলে দাবি করতাম। যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হত কীভাবে পড়তে পারি তখন আমি দোকানের সাইনবোর্ডের কথা বলতাম। ফরাসিতে রুটি-বিস্কিট যারা বানায় তাদের বলে boulanger আর কসাইকে বলে boucher। সাইনবোর্ডে শব্দ দু'টোর বানানের প্রথম তিনটি অক্ষরের (bou) মিল খুঁজে পেতাম। কাঠামোবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যাপারটা সম্ভবত এরকমই কিছু একটা। কাঠামোবাদ হচ্ছে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান, বা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্যসূচক উপাদানের সন্ধান।

এ ধরনের অনুসন্ধান সারা জীবন ধরেই আমার একটা মৌলিক আগ্রহ হিসেবে থেকেছে। ছেলেবেলায় আমার আগ্রহ জেগেছিল ভূতত্ত্বের প্রতি। ভূতত্ত্বেরও সমস্যা হচ্ছে নিসর্গের অমিত বৈচিত্র্যের মধ্যে সাধারণের সন্ধান।। সাধারণ অর্থাৎ সাধারণ বৈশিষ্ট্য যার ফলে নিসর্গকে ভূতত্ত্বের কয়েকটি স্তরে এবং প্রক্রিয়ায় নামিয়ে এনে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। পরবর্তীকালে আমার

অবসরের অনেকটাই কেটেছে অপেরার পোষাক আর সেটের নকশা করে। সেখানেও আমি দেখতে পেয়েছি একই ব্যাপার। সেটা হল একই ভাষায় প্রকাশের সমস্যা। অপেরার সঙ্গীত এবং লিব্‌রেট্টোতে যা প্রকাশ করা হচ্ছে তা রেখাচিত্র ও পেইন্টিং-এ প্রকাশ করতে হবে। অর্থাৎ এখানে চেষ্টাটা হচ্ছে খুব জটিল একগুচ্ছ সঙ্কেত (সঙ্গীত সঙ্কেত, সাহিত্য সঙ্কেত, চিত্রকলার সঙ্কেত) থেকে সাধারণ সুরটিতে পৌঁছানো। এখানে সমস্যা হল বিভিন্ন ধরনের সঙ্কেতের মধ্যে সাধারণ সাদৃশ্যের জায়গাটিকে খুঁজে বের করা। অনেকে বলবেন এটা আসলে রূপান্তরের সমস্যা, এক ভাষায় (বা এক সঙ্কেতে) প্রকাশিত বস্তু আরেক ভাষায় প্রকাশ করার সমস্যা।

কাঠামোবাদ ব্যাপারটাকে বা এই শিরোনামে যা চলছে তাকে লোকজন একেবারে নতুন কিছু, বৈপ্লবিক কিছু বলে মনে করে। আমার অবশ্য একে দু'দিক থেকে অকারণ মনে হয়। প্রথমত, কলাবিদ্যার ক্ষেত্রেও এমন কি এটা নতুন কিছু নয়। আমরা চিন্তার এই ধারাটিকে রেনেসাঁর সময় থেকে শুরু করে উনিশ শতক হয়ে আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করে আসছি। এটা আরেক দিক থেকেও ঠিক না। আমরা ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেটাকে কাঠামোবাদ বলছি সেটা আসলে ইংরেজীতে যে বিষয়গুলোকে 'হার্ড সায়েন্স' বলে তারা সবসময়ই যে কাজটা করে আসছে তারই একটা ঝাপসা অনুকরণ।

বিজ্ঞান শুধু দু'ভাবে এগুতে পারে: হ্রাসমূলক পদ্ধতিতে অথবা কাঠামোবাদের সাহায্যে। যখন এক স্তরের জটিল ঘটনাবলী আরেক স্তরে সরল করে প্রকাশ করা যায় তখন এটি হ্রাসমূলক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জীবন-প্রক্রিয়ার বহু ঘটনা আমরা সাধারণ শারীররসায়ন প্রক্রিয়ায় নামিয়ে এনে পুরোটা না হলেও অনেকটা ব্যাখ্যা করতে পারি। আর যেসব ঘটনা এত জটিল যে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় হ্রাস করে ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব না, তখন আমরা সেগুলোর একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক অনুসন্ধান করি। চেষ্টা করি এসব প্রপঞ্চের মৌলিক কাঠামোটিকে বুঝতে। আর ঠিক এটাই আমরা করে আসছি ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং অন্যান্য বিষয়ে।

এটা সত্যি যে প্রকৃতিতে প্রক্রিয়ার সংখ্যা সীমিত এবং প্রকৃতি (তর্কের খাতিরে আমরা প্রকৃতিকে একটি প্রাণবতী সত্তা হিসাবে দেখছি) একটি পর্যায়ে যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তা অনিবার্যভাবেই আরেক পর্যায়ে দেখা দেবে।

এখানে জিন সঙ্কেত খুব ভাল একটা উদাহরণ হতে পারে। সবাই জানে যে, জিন বিশেষজ্ঞ ও জীববিজ্ঞানীরা যখন তাঁদের আবিষ্কার ব্যাখ্যা করতে গেলেন তখন তাঁদের শরণ নিতে হল ভাষাতত্ত্বের ভাষার, তাঁরা জিনের ব্যাখ্যা করতে ধার করলেন শব্দ, বাগধারা, উচ্চারণ, যতি ইত্যাদি। আমি একেবারেই বলছি না যে এ দুটো একই; অবশ্যই তারা এক না। কিন্তু তারা বাস্তবতার দুটি ভিন্ন তলে উদ্ভূত একই ধরনের দু'টি সমস্যা।

সংস্কৃতিকে প্রকৃতির পর্যায়ে নামিয়ে আনা আমার উদ্দেশ্য নয় মোটেই। সে জাতীয় দুরভিসন্ধি থেকে আমি বহু দূরে। কিন্তু আমরা সংস্কৃতিতে যা ঘটতে দেখি ফর্মের দিক থেকে তা একই (পুরোটা বলছি না)। আমরা একই ধরনের সমস্যা প্রকৃতির স্তরেও ঘটতে দেখি। তবে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে সংস্কৃতির সমস্যা আরো অনেক জটিল এবং অনেক বেশী সংখ্যক সূচকের দাবি রাখে।

আমি এ বিষয়ে কোনো দর্শন বা এমন কি কোনো তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করছি না। ছোটকাল থেকেই অযৌক্তিক আমাকে বড় পীড়া দেয়। আমি সবসময়ই চেষ্টা করেছি আমাদেরকে যা একটি মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা হিসাবে দান করা হয়েছে তার একটা নিয়মতান্ত্রিক, যৌক্তিক রূপ দিতে। আমি যে শেষমেষ নৃতাত্ত্বিকে পরিণত হয়েছি তার কারণ এই নয় যে আমি এটা হতে চেয়েছি, বরং আমি আসলে দর্শনের কবল থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। সে সময়ে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আলাদা বিষয় হিসাবে নৃতত্ত্ব পড়ানো হত না। তখন নৃতত্ত্বে পালানোর সুযোগ ছিল একমাত্র দর্শনের ছাত্র ছিল এবং দর্শন পড়ায় এরকম ব্যক্তিরই। আমি সেখানেই পালিয়েছিলাম এবং অবধারিতভাবে একটা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে এত নানান রকম বিয়ের রীতি প্রচলিত এবং যেগুলো এত অর্থহীন! ব্যাপারটা আরো বিরক্তিকর কারণ যদি এই রীতিনীতিগুলো অর্থহীন হয় তাহলে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর জন্য আবার আলাদা রীতি লাগবে। তবে সেক্ষেত্রে বিয়ের রীতিগুলো হয়তো কম-বেশী নির্দিষ্ট হতে পারত। শেষে উপলব্ধি করলাম, যখন একই অদ্ভুত ব্যাপার বারবার ঘটতে থাকে এবং যাকে প্রতিস্থাপিত করলে আরেক ধরনের অদ্ভুত ব্যাপারই শুধু ঘটে তখন বুঝতে হবে ব্যাপারটা আসলে পুরোপুরি অদ্ভুত বা অকারণ নয়।

এটাই ছিল আমার প্রথম কাজ। আপাত বিশৃঙ্খল একটি বিষয়ের শৃঙ্খলা খুঁজে বের করা। বিবাহ রীতি ও গোত্র সম্পর্কের ওপর কাজ করার পর আমি যখন ঘটনাক্রমে (অর্থাৎ কোনো বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে নয়) মিথলজি নিয়ে কাজ আরম্ভ করলাম তখন আবারও পড়লাম ঠিক একই সমস্যায়। মিথের গল্পগুলোকে মনে হয় স্বেচ্ছাচারী, অর্থহীন এবং অদ্ভুত; কিন্তু আবার একইসাথে সারা পৃথিবী জুড়েই আমরা এই গল্পগুলো বারবার শুনতে পাই। আমাদের হৃদয়ের কোনো 'উৎকাল্পনিক' সৃষ্টি হলে তা একটি জায়গাতেই দেখা দেওয়ার কথা। সেই একই উৎকল্পনা আপনি সচরাচর একেবারে অন্য একটা জায়গায় খুঁজে পাবেন না। আমার কেবল উদ্দেশ্য ছিল এই আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা আছে কিনা তা খুঁজে দেখা। তবে এ বিষয়ে কোনো উপসংহারে পৌঁছাতে পেরেছি বলে দাবি করব না।

আমি মনে করি শৃঙ্খলা ছাড়া অর্থ বোঝা অসম্ভব। সেমানটিকস্-এর সবচেয়ে অদ্ভুত সমস্যা এই যে 'অর্থ' শব্দটার অর্থ বের করা সবচেয়ে দুষ্কর। 'অর্থ' কথাটার প্রকৃত অর্থ কী? আমার যেটা মনে হয়, 'অর্থ'-এর একটাই মানে হতে পারে: কোনো তথ্যকে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় প্রকাশ। আমি এখানে অবশ্যই ফরাসী বা জার্মান এ ধরনের ভাষায় কথা বলছি না – এখানে আরেকটি স্তরে বা তলে শব্দের কথা বলা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে সেই রূপান্তর বা তরজমা যা আপনি অভিধান থেকে পেতে চান: একটি নির্দিষ্ট শব্দের অর্থ কতগুলো অন্য শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হবে। যে কথাগুলো দিয়ে সেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেগুলো বস্তুত আরেকটি তলে আপনার জানতে চাওয়া শব্দ বা অভিব্যক্তিটিরই মত - ইংরেজীতে যাকে আমি আইসোমরফিক বলছি। প্রশ্ন উঠেছে, নিয়ম ছাড়া তরজমার চেহারা কেমন দাঁড়াবে? সেক্ষেত্রে তরজমা বোঝাই যাবে না। কেননা আপনি একটি শব্দের অনুবাদে অন্য যে কোনো শব্দ বসাতে পারেন না বা একটি বাক্যের অনুবাদ ইচ্ছামত যে কোনো বাক্য দিয়ে করতে পারেন না। অনুবাদের নির্দিষ্ট নিয়ম থাকতে হবে। আসলে অর্থ করা এবং শৃঙ্খলার সন্ধান - এ দু'টো একই জিনিস। যদি আমরা সারা পৃথিবীতে মানুষের বৌদ্ধিক কার্যকলাপের দিকে তাকাই, দেখব তার একটা মূল লক্ষ্য ছিল এক ধরনের শৃঙ্খলা স্থাপন। এটা যদি মানবমনের একটি মৌলিক

প্রয়োজনের প্রতি নির্দেশ করে এবং মানুষের মন নিঃসন্দেহে বিশ্বপ্রকৃতিরই একটি অংশ; সেক্ষেত্রে বলা যায় বিশ্ব প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা আছে বলেই মানব মনে এই বোধের জন্ম হয়েছে।

এখানে আমি যা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও আমি যাকে বলেছি 'লজিক অব কংক্রিট' – এ দু'য়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটেছিল। 'লজিক অব কংক্রিট' হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে পাওয়া তথ্য ও এর মর্যাদা, অন্য দিকে আছে ইমেজ, প্রতীক ইত্যাদি। এই বিচ্ছেদ আসলে দরকার ছিল। এখন আমরা এমন একটি প্রক্রিয়া দেখছি যখন এই বিচ্ছেদের অবসান আসন্ন বা যা হবে আগের প্রক্রিয়ার উল্টো। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান দেখা যাচ্ছে শুধু যে এর নিজের গতানুগতিক সঙ্কীর্ণ এবং মসৃণ পথেই ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে তাই নয়, সেই সঙ্কীর্ণতাকে যথাসম্ভব প্রসারিত করে সেখানে বহু সমস্যার আত্মীকরণও করছে যেগুলো হয়ত আগে তার নজরেই ছিল না।

এবার হয়ত অনেকেই আমার সমালোচনা করবেন অতিমাত্রায় 'বৈজ্ঞানিকতাবাদী' বলে। মনে করবেন আমি অন্ধ বিজ্ঞানবিশ্বাসী বা বিশ্বাস করি যে বিজ্ঞান প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। আসলে ব্যাপারটা তা না। বিজ্ঞান সর্বরোগহর বটিকা এটা আমিও বিশ্বাস করি না কারণ এমন কোনো সময়ের কল্পনা আমার আসে না যখন কিনা বিজ্ঞানকে আমরা পরিসমাপ্ত এবং সর্বার্থে অর্জিত অবস্থায় দেখব। সমস্যা সবসময় থাকবে। কয়েক বছর বা কয়েক শতাব্দী আগে যেগুলোকে একান্তই দর্শনিক সমস্যা বলে ভাবা হত, বিজ্ঞান সেগুলোকে যে গতিতে সমাধা করেছে ঠিক একই গতিতে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেবে। এমন সব সমস্যা দেখা দেবে যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না। বিজ্ঞান আমাদের প্রশ্নের উত্তর যোগাবে আর সেই উত্তর থেকে জন্ম নেবে নতুন প্রশ্ন। এই ফাঁক কখনো বন্ধ হওয়ার না। বিজ্ঞান আমাদের সব উত্তর কখনোই দিতে পারবে না। আমরা বড় জোর চেষ্টা করতে পারি ধীরে ধীরে প্রশ্নোত্তরের সংখ্যা ও তার মান বাড়ানোর। আর সেটা করা যেতে পারে একমাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমেই।

[নিবন্ধটির ইংরেজী শিরোনাম: The Meeting of Myth and Science]

টীকা

১. Invariant—সাধারণ বৈশিষ্ট্য

২. Graphic art—রেখাচিত্র

৩. Libretto—লিব্‌রেট্টো। এই নিবন্ধে অপেরার টেক্সট অর্থে ব্যবহৃত। ইংল্যান্ডে শব্দটি প্রথম ১৭৪২ সালে ব্যবহার করা হয়। [উৎস: পেঙ্গুইন রেফারেন্স-*এর আ ডিকশনারি অব লিটারারি টার্মস*]

৪. Reductionist way—হ্রাসমূলক পদ্ধতি

৫. Genetic code—জিন সঙ্কেত

৬. Semantics—সেমানটিকস। ভাষাতত্ত্বের একটি শাখা। সেমানটিকস শব্দের অর্থ ও অর্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া এখানে বস্তুর সাথে শব্দের সম্পর্ক, ভাষার সাথে চিন্তা ও আচরণের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়। অর্থাৎ মানুষের আচরণের ওপর তার নিজের বা অন্যের উচ্চারিত ভাষার কী প্রভাব পড়ে তা নিয়ে সেমানটিকস আলোচনা করে। [উৎস: পেঙ্গুইন রেফারেন্স-এর *আ ডিকশনারি অব লিটারারি টার্মস*]।

৭. Isomorphic—দুই বা ততোধিক বস্তুর একই বা প্রায় একই রকম গঠন (জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। [উৎস: *ওয়েবস্টার এনসাইক্লোপেডিক ডিকশনারি*]

৮. Fanciful– উৎকাল্পনিক

৯. Scientistic—বৈজ্ঞানিকতাবাদী

দ্বিতীয় অধ্যায়

'আদিম' চিন্তা ও 'সভ্য' মন

যাদেরকে আমরা সাধারণত এবং ভুলভাবে 'আদিম' মানুষ বলে-থাকি। ('লেখাহীন' বলেই তাদেরকে ডাকা যাক কারণ তাদের সাথে এটাই আমাদের আসল তফাৎ) , তাদের সাধারণত দু'ভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যার কোনোটাই আমার মতে ঠিক নয়। প্রথম ধারা অনুসারে, তাদের ভাবনার ধরন বেশ মোটা দাগের, স্থূল। সমসাময়িক নৃতত্ত্বে এই ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে একটি নামই মনে আসছে - ম্যালিনস্কি। একই সাথে ম্যালিনস্কি সম্পর্কে আমার দারুণ শ্রদ্ধার ব্যাপারটিও জানিয়ে রাখতে চাই। নিঃসন্দেহে তিনি মহান নৃতাত্ত্বিকদের অন্যতম এবং তাঁর অবদানকে আমি কোনোভাবেই বিদ্রুপ করছি না। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তিনি যে জনগোষ্ঠীর ওপর কাজ করছেন তারাসহ যেসব জনগোষ্ঠীর লিখিত ভাষা নেই, তাদের বেঁচে থাকাটা একান্তভাবেই মৌলিক জৈবিক চাহিদার ওপর নির্ভরশীল বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে কোনো জনগোষ্ঠী একান্ত জৈব চাহিদা যেমন অন্ন সংস্থান, যৌন তৃপ্তি মেটানো ইত্যাদি কেন্দ্রিক হলে আপনি তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, মিথলজি ইত্যাদি অনেক কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারবেন। নৃতত্ত্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এই ধারণা সাধারণভাবে ফাংশনালিজম নামে পরিচিত।

এ সম্পর্কিত অন্য ঘরানার চিন্তাটি হচ্ছে এ ধরনের জনগোষ্ঠীর ভাবনার ধারা ঠিক নিম্নমানের না তবে মূলগতভাবেই ভিন্ন প্রকৃতির। এ ঘরানাটি দেখতে পাওয়া যাবে লেভি ব্রুহল-এর লেখায়। তাঁর মতে 'আদিম' চিন্তার (আমি সবসময়েই 'আদিম' কথাটাকে উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরে রাখি) সাথে

আধুনিক চিন্তার তফাৎ এই যে, প্রথম ধারাটির প্রধানতম নির্ণায়ক আবেগ এবং আধ্যাত্মিক বা মিষ্টিক প্রকাশ। ম্যালিনস্কির তত্ত্ব যেখানে উপযোগবাদী, অন্যটি সেখানে আবেগী ধারণার প্রবক্তা। আমি বারবারই যে বিষয়টি জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে লেখাবিহীন জনগোষ্ঠীর ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক হতে সক্ষম, ম্যালিনস্কির ধারণার যা বিপরীত। অন্যদিকে তাদের ভাবনা বুদ্ধিবৃত্তিক হতে সক্ষম যা লেভি-ব্রুহল-এর ধারণার বিপরীত।

টোটেমিজম এবং *দ্য স্যাভেজ মাইন্ড* বই দু'টিতে আমি দেখাতে চেয়েছি যে এসব জনগোষ্ঠী যাদেরকে আমরা পুরোপুরি জৈবিক প্রয়োজন, ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং কঠোর পারিপার্শ্বিকে জীবন রক্ষার নিরন্তর প্রচেষ্টার অধীন বলে মনে করছি তারা চমৎকার নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার অধিকারী হতে পারে। এর অর্থ এই যে, চারপাশের জগৎ, এর প্রকৃতি ও নিজেদের সমাজকে বোঝার প্রেরণা তাঁদেরও ভালভাবেই রয়েছে। অন্যদিকে এই অভীষ্ট অর্জনে তাঁরা দার্শনিকের মতই বা এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের মত বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে অগ্রসর হন।

এটাই আমার মূল প্রস্তাবনা।

এই সুযোগে আমি একটি ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ফেলতে চাই। কোনো এক ধরনের ভাবনাকে নৈর্ব্যক্তিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা বলার অর্থ তাকে বৈজ্ঞানিক ভাবনা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া নয়। এ ধরনের চিন্তা যে ভিন্ন সেটা এক কারণে আবার এর গৌণতার কারণ আর এক। এই চিন্তার ভিন্নতার কারণ এই যে এটি সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথে মহাজাগতিক সত্যের স্বরূপ বুঝতে চায়: বুঝতেই শুধু চায় না, সামগ্রিকভাবে বুঝতে চায়। এটা এমন এক ধরনের চিন্তা যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত এরকম যে সবকিছু বুঝতে না পারলে আপনি কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। এটা বৈজ্ঞানিক চিন্তা যা করে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধাপে ধাপে আগায়, প্রত্যেক সীমিত ও সামান্য প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে ও পরের প্রপঞ্চটিতে যায়। ঠিক যেভাবে দেকার্তে বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক চিন্তা কোনো সমস্যা ব্যাখ্যার জন্য যতটা সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একে ভাগ করে।

ফলে আদিম মননের সামগ্রিকতার এই আকাঙ্ক্ষা বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রক্রিয়া থেকে আলাদা। সবচেয়ে বড় তফাৎ অবশ্য এই যে, এই আকাঙ্ক্ষা

কখনো তৃপ্ত হয় না। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চিন্তা আমাদেরকে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তারে সাহায্য করেছে যেটা যথেষ্ট স্পষ্ট হওয়ায় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে মিথ মানুষকে পরিবেশের ওপর বস্তুগত অধিকার দিতে অপারগ। তবে মিথ মানুষকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রমটি দেয় তা হচ্ছে সে বিশ্বপ্রকৃতিকে বুঝতে সক্ষম। তবে সেটা বিভ্রমই, সত্য নয়।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা করতে যেয়ে আমরা আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা খুব কমই ব্যবহার করে থাকি। আমরা চিন্তা ক্ষমতা ততটুকু ব্যবহার করি যতটা আমাদের পেশা, ব্যবসা বা আমাদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দরকার হয়। ফলে কেউ যদি মিথ বা জ্ঞাতি পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে তার সাথে বছর বিশেক বা তারো বেশী সময় ধরে জড়িত থাকে, তখন এই প্রক্রিয়ায় যে ধরনের মানসিক শক্তি দরকার হয় তা ব্যবহার করতে পারবে। তবে সকলে ঠিক একই বিষয়ে আগ্রহী হবে এমন আশা করাটা ঠিক না; তাই আমাদের যার যে বিষয়ে আগ্রহ সে বিষয়ে আমাদের মানসিক শক্তির একটা নির্দিষ্ট অংশ ব্যবহার করি।

আজকের দিনে আমরা অতীতের চেয়ে কখনো কম আবার কখনো বেশী মানসিক শক্তি ব্যবহার করি; এবং আগে যে ধরনের মানসিক শক্তি আমরা ব্যবহার করতাম আজকের যুগে ব্যবহৃত মানসিক শক্তির প্রকৃতি সেরকম না। যেমন, এখন আমরা ইন্দ্রিয়জ ধারণা অনেক কম ব্যবহার করি। আমি যখন *মিথলজিক্স (ইন্ট্রোডাকশন টু আ সায়েন্স অব মিথলজি)*-এর প্রথম বয়ান লিখছিলাম তখন খুব রহস্যময় একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। এমন এক জনগোষ্ঠীর কথা আমি জানতে পারলাম যাঁরা প্রখর সূর্যালোকেও সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতেন। ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য ঠেকল। তখন বিষয়টা নিয়ে পেশাদার জ্যোতির্বিদদের কাছে গেলে তাঁরা বললেন শুক্রগ্রহ থেকে দিনের বেলা যে পরিমাণ আলো প্রতিফলিত হয় তাতে আমরা না দেখলেও কিছু লোক যদি একে দেখতে পায় তাতে আশ্চর্য হাওয়ার কিছু নেই। পরে আমি আমাদের নিজেদের সভ্যতার অন্তর্গত প্রাচীন মানুষদের নৌযাত্রার বিবরণ ঘেঁটে দেখলাম যে তখনকার নাবিকরাও প্রখর সূর্যালোকে শুক্রগ্রহ দেখতে পেতেন। হয়ত এখনকার আমরাও দেখতে পেতাম যদি আমাদের সেই চর্চাটা থাকত।

গাছ বা পশুপাখি সম্পর্কে জ্ঞান বিষয়েও আমাদের সেই একই অবস্থা। যেসব জনগোষ্ঠীর লিখিত ভাষা নেই তারা তাদের পরিবেশ ও সব প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে। এসবই (জ্ঞান) আমরা হারিয়ে ফেলেছি তবে সেটা বিনা কারণে নয়। এর পরিবর্তে আমরা এখন দুর্ঘটনা ছাড়াই বেগে মোটর গাড়ী চালাতে পারি অথবা সন্ধ্যায় টেলিভিশন বা রেডিও ছেড়ে বসে থাকতে পারি। বিষয়টি এক ধরনের মানসিক সক্ষমতার আভাস দেয় যার প্রয়োজন 'আদিম' মানুষের নেই। আমি যেটা অনুভব করি, 'আদিম' মানুষদের যে মানসিক সামর্থ্য রয়েছে তাতে করে তাঁরা নিজেদের জীবনের মান আমূল বদলে ফেলতে পারেন, কিন্তু যে ধরনের জীবন তাঁরা যাপন করেন বা প্রকৃতির সাথে তাঁদের যে সম্পর্ক তাতে এসবের দরকার তাঁদের আদৌ নেই। সামগ্রিকভাবে মানবজাতির যে মানসিক সামর্থ্য রয়েছে তার সবগুলি আপনি এক লহমায় পেতে পারেন না। আপনি একটি ছোট ক্ষেত্র মাত্র ব্যবহার করতে পারেন, এবং সংস্কৃতি ভেদে সেই ক্ষেত্রও এক না। এটাই সবচেয়ে বড় কথা। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারগুলোর একটি সম্ভবত এই যে, মানবজাতির বিভিন্ন অংশে বিরাজিত সাংস্কৃতি ভিন্নতা সত্ত্বেও মানবমস্তিস্ক সর্বত্রই এক এবং একই ধরনের সামর্থ্যের অধিকারী। আমার মনে হয় এটা এখন সকলেই স্বীকার করেন।

পৃথিবীতে বিরাজমান বিভিন্ন সংস্কৃতি খুব পদ্ধতিগতভাবে বা নিয়ম বেঁধে একে অপরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেছে এটা আমার মনে হয়নি। সত্যিটা হচ্ছে হাজার হাজার বছর যাবৎ এই পৃথিবীর বুকে মানুষের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় অন্য জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করত। ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকেরই তৈরী হয়েছিল স্বতন্ত্র জীবনধারা। এরকম হওয়াটা যে তাদের লক্ষ্য ছিল তা না। বরং এটা ছিল ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে যে প্রক্রিয়া চলেছিল তার স্বাভাবিক ফসল।

এখন এই স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারটাকে আপনারা ক্ষতিকর ভাবেন বা গোষ্ঠীসমূহের সাংস্কৃতিক তফাত তুলে দিয়ে সব এক হয়ে যেতে হবে এরকম মনে করেন এটা আমার অভিপ্রেত নয়। প্রকৃত ব্যাপারটা হল এই তফাতগুলো খুব ফলদায়ক এই অর্থে যে এইসব ফারাকগুলোর মধ্য দিয়েই প্রগতি সম্ভব

হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের জন্য যা বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিয়েছে সেটাকে আমরা অতি-যোগাযোগ বা ওভার কমিউনিকেশন বলতে পারি। অর্থাৎ পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে আর সব প্রান্তে কী ঘটে চলেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানার প্রবণতা। একটি সংস্কৃতির পক্ষে ঠিক নিজের মত হয়ে ওঠার জন্য এবং মৌলিক কিছু জন্ম দেওয়ার জন্য, সেই সংস্কৃতিকে ও এর সদস্যদের নিজের অনন্যতা সম্পর্কে যেমন আস্থাশীল হতে হয় তেমনি অন্তত কিছুটা হলেও অন্য গোষ্ঠীর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের এক ধরনের ভাব থাকতে হয়। একমাত্র উন-যোগাযোগ বা আন্ডার কমিউনিকেশনের শর্তেই একটি সংস্কৃতি মৌলিক কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ যুগে ভোক্তা হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই যেন আমাদের ভীষণ বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমরা এখন দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় সকল সংস্কৃতির যে কোনো কিছু আত্মসাৎ করতে পারি, কিন্তু তার ফলে নিজেদের মৌলিকতাই খোয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

আমরা এখন এমন এক পৃথিবীর ছবি চোখের সামনে দেখতে পাই যেখানে সারা দুনিয়ায় কেবল একটি মাত্র সংস্কৃতি বিরাজ করবে। এরকমটা আদৌ ঘটবে বলে আমি বিশ্বাস করি না কারণ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের দ্বান্দ্বিক প্রবণতা সব সময়েই কাজ করবে - একদিকে থাকবে একীকরণের চেষ্টা, অন্যদিকে কাজ করে যাবে স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার প্রবণতা। একটি সভ্যতা যত বেশী সমধর্মী হওয়ার পথে আগাবে, এর ভেতরে বিরাজিত ফারাকের রেখাগুলো তত বেশী স্পষ্ট হবে। এক পর্যায়ে যা অর্জিত হবে, আরেক পর্যায়ে গিয়ে তা হারিয়ে যাবে। এটা আমার একান্তই নিজস্ব অনুভূতি, এ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটির কোনো বাস্তব প্রমাণ আমার হাতে নেই। তবে মানবজাতি অভ্যন্তরীণ কোনো বৈচিত্র্য ছাড়াই বেঁচে আছে এটা আমি কল্পনা করতে পারি না।

কানাডার একটা মিথ নিয়ে একটুখানি আলাপ করি। এক স্কেট মাছের দখিনা হাওয়াকে বন্দী করার গল্প এটা। এ এমন এক সময়ের গল্প যখন পৃথিবীতে মানুষ ছিল না অর্থাৎ যখন জগতে পশু ও মানুষ সেভাবে আলাদা হয়ে ওঠেনি; প্রাণীরা সব অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক পশুর মত ছিল। সেসময় ভীষণ বাতাসে সবকিছু বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কারণ বাতাস বিশেষ করে খারাপ বাতাসেরা সবসময়ই বয়ে যেত। আর তার ফলে মাছ ধরা ও সাগরবেলায় ঝিনুক কুড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাই প্রাণীকুল এই

বাতাসদেরকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেয়। একটা অভিযান চালানো হল যেখানে দখিনা হাওয়াকে পরাস্ত করতে স্কেট মাছের সাথে কিছু মানুষ-পশু বা পশু-মানুষও অংশ নিল। দখিনা হাওয়া হল বন্দী। ভবিষ্যতে আর এভাবে সারাক্ষণ বইবে না, শুধু মাঝে-মধ্যে বইবে এই শর্তে দখিনা হাওয়া ছাড়া পেল। সেই থেকে দখিনা হাওয়া বছরের কিছুদিন বয়ে যায় বা দুই দিনে একদিন বয়। বাকি সময়টা মানুষজন নিজের কাজ নির্বিঘ্নে করতে পারে।

তো এই ঘটনা বাস্তবে কখনো ঘটেনি। তবে এটা ভেবে তৃপ্ত থাকার কোনে কারণ নেই যে ঘটনাটি যারপরনাই কিম্ভূত এবং বায়ুগ্রস্ত মাস্তিষ্কের উত্তপ্ত কল্পনার ফসল। কাহিনীটিকে আমাদের গুরুত্বের সাথে নিতে হবে এবং নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে: কেন স্কেট মাছ, কেনই বা দখিনা হাওয়া?

আপনি যদি মন দিয়ে কাহিনীটির দিকে লক্ষ্য করেন তবে স্কেট মাছের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা আপনার চোখে পড়বে। এতে বর্ণিত স্কেট মাছের চরিত্রে দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা দেখতে আর সব চ্যাপ্টা মাছের মত, এর নীচের অংশ পিছল আর পিঠের দিকটা খরখরে। স্কেট মাছের আরেকটি ক্ষমতা যেটা শত্রু মোকাবেলার সময় একে তাড়াতাড়ি চম্পট দিতে সাহায্য করে সেটা হচ্ছে এটিকে ওপর বা নীচ থেকে দেখতে বিরাট মনে হয় কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বোঝা যায় এটার বেধ খুব পাতলা অর্থাৎ পিঠ আর পেটের মধ্যে দৈর্ঘ্য খুব অল্প। শত্রু হয়ত ভাবছে যেহেতু মাছটা খুব বড়, সহজেই একে তীর ছুঁড়ে ঘায়েল করা যাবে। কিন্তু তীর নিশানা করলেই দেখা যায় স্কেট মাছ নিমেষে ঘুরে বা পিছলে যাচ্ছে। ফলে মাছটাকে এর পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। এর বেধ এত কম যে সেখানে আর তীর বেঁধানো সম্ভব না। তাই স্কেট মাছকে কাহিনীটিতে আমদানি করা হয়েছে কারণ, সাইবারনেটিক্সের ভাষায় বললে – এটি কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর দিতে সক্ষম। স্কেট মাছ দুটি বিপরীত অবস্থা তৈরী করতে পারে, একটা ইতিবাচক বা পজিটিভ, অপরটি নেতিবাচক বা নিগেটিভ। এই মিথটিতে স্কেট মাছকে যে ধরনের কাজে লাগানো হয়েছে তার সাথে (আমি অবশ্য সাদৃশ্যের বিষয়টিকে খুব বেশী দূর টানতে চাই না) আধুনিক কম্পিউটারে যেভাবে 'হ্যাঁ/'না' (বাইনারি পদ্ধতি) পদ্ধতি ব্যবহার করে খুব জটিল সব সমস্যা সমাধান করা হয় তার তুলনা করা চলে।

বাস্তবতার নিরিখে আমরা সকলেই বুঝি মাছের পক্ষে বাতাসের সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব না, কিন্তু অভিজ্ঞতাজাত চিত্রকল্প কেন ব্যবহার করা যায় তার যুক্তিটিও আমাদের অজানা নেই। মিথজ ভাবনার এটাই মৌলিক দিক – ধারণাগত চিন্তার ভূমিকা পালন করে এটি: যুক্তির দিক থেকে, বাইনারির জটিলতা আছে এ ধরনের সমস্যার সাথে যুক্ত করে একটা প্রাণীকে ব্যবহার করা যেতে পারে আমি যাকে বাইনারি অপারেটর নাম দিয়েছি সেই হিসাবে। দখিনা হাওয়া যদি বছরের প্রত্যেকদিন বইতে থাকে তবে মানুষের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি দু'দিনে একদিন বয় অর্থাৎ একদিন হবে 'হ্যাঁ', একদিন 'না' ইত্যাদি, তাহলেই পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজন আর প্রকৃতিতে বিরাজিত অবস্থাসমূহের মধ্যে একটা ভারসাম্য তৈরী হবে।

এভাবে যুক্তির দিক থেকে স্কেট মাছের মত প্রাণী আর মিথটি যে ধরনের সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করছে তার মধ্যে সাযুজ্য বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির জায়গা থেকে মিথটি সত্যি না, কিন্তু আমরা মিথটির আসল চরিত্র উপলব্ধি করতে পেরেছি এমন একটা সময়ে এসে যখন সাইবারনেটিক্স ও কম্পিউটার এসে গেছে। কিন্তু বাইনারি অপারেশনের এই ব্যাপারটি খুব ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে হলেও মিথীয় ভাবনায় বস্তু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। ফলে এখনকার সময়ে এসে মিথীয় চিন্তা ও বিজ্ঞানের মধ্যে ছাড়াছাড়ি ঘটেছে এমন ভাবাটা ঠিক না। বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার বর্তমান অবস্থাই আমাদেরকে এই মিথে আসলে কী আছে তা বুঝতে সাহায্য করছে। বাইনারি প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে মিথের এই তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম না।

আমি আসলে চাই না আপনারা এরকম মনে করেন যে আমি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও মিথীয় ব্যাখ্যা এই দুটোকে একই তলে রাখতে চাই। আমি যা বলতে চাইছি, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মহত্ত্ব ও উচ্চতর অবস্থান বিজ্ঞানের বাস্তব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্যের মধ্যেই কেবল নিহিত নেই। বরং আমরা ক্রমেই যা দেখতে পাচ্ছি, বিজ্ঞান শুধু যে নিজের সত্যতার ব্যাখ্যা দিতে পারছে তাই না, ব্যাখ্যা দিতে পারছে মিথীয় চিন্তার মধ্যে বিদ্যমান সত্যটুকুরও। গুরুত্বপূর্ণ হল আমরা দিন দিন এই গুণগত দিকগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছি এবং বিজ্ঞান যেখানে সতের শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত শুধুমাত্র পরিমাণগত বিষয়ে

আগ্রহী ছিল, সেখানে এখন এটি বাস্তবের গুণগত দিকগুলিও বিবেচনায় নিয়ে আসছে। এর ফলে আমরা মিথীয় ভাবনার অনেক দিক যেগুলোকে অতীতে অর্থহীন এবং অদ্ভুত মনে করে পাত্তা দিতাম না সেগুলোকে এখন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার অবকাশ হবে। এই প্রবণতা জীবন ও চিন্তার মধ্যে অপূরণীয় শূন্যতা বিরাজমান - সতের শতকী এই দার্শনিক দ্বৈততা থেকে আমাদের বিশ্বাসকে মুক্তির পথ দেখাবে। আমাদের চেতনায় যা ঘটছে তা জীবনের মৌলিক প্রপঞ্চগুলো থেকে খুব আলাদা কিছু না - হয়ত এই বিশ্বাসে আমরা একদিন উপনীত হতে পারব। সেই বিশ্বাসেরই ধারাবাহিকতায় মানবজাতি এবং অন্য প্রাণীকুল ও উদ্ভিদের মধ্যেকার তফাৎ অপূরণীয় নয় এই উপলব্ধি আমাদের জ্ঞানকে হয়ত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে দেবে যা নিজেদের জ্ঞানের সামর্থ্য সম্পর্কে আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক উঁচুতে।

প্রবন্ধের ইংরেজী শিরোনাম: 'Primitive' Thinking and the 'Civilized' Mind.

টীকা

1. Functionalism—বৃত্তিবাদ
2. Affective—আবেগী

তৃতীয় অধ্যায়

কাটাঠোঁট আর যমজের গল্প: একটি মিথের ব্যবচ্ছেদ

শুরু করছি স্পেনীয় মিশনারি ফাদার পি জে ডি আরিয়াগা বর্ণিত একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা দিয়ে। ষোড়শ শতকে এই মিথটি ফাদার লিপিবদ্ধ করেছিলেন মাতৃভাষায় লেখা তাঁর *এক্সতারপেসিওঁ দি লা আইদোলেত্রিয়া দেল পেরু* (লিমা ১৬২১) (*Extirpacion de la Idolatria del peru*) বইতে। তিনি লিখেছিলেন পেরুর কিছু এলাকায় যখন হাড় কাঁপানো শীত পড়ে তখন পুরুতরা এলাকার সব যমজ, মাতৃগর্ভ থেকে জন্মের সময় যাদের পা আগে ছিল এবং যাদের ওপরের ঠোঁট কাটা (যাকে ইংরেজীতে হেয়ারলিপ্স বলে) তাদেরকে জড়ো করে দারুণ শীতের জন্য দায়ী করে। বলা হয়ে থাকে তারা লবণ মরিচ খেয়ে আবহাওয়ার এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তখন তাদের অনুতাপ ও পাপ স্বীকারের নির্দেশ দেওয়া হয়।

যমজদেরকে আবহাওয়ার বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করার এই রীতি সাধারণভাবে কানাডাসহ পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। এটা অনেকেই জানে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার উপকূলবাসী ইন্ডিয়ান আদিবাসীরা যমজদের ভাল আবহাওয়া নিয়ে আসার ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন যমজরা ঝড় ও আবহাওয়া বিষয়ক অন্যান্য ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে এখানে আমি ঠিক এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করতে বসিনি। আমাকে যে বিষয়টি ভাবিয়েছে তা হল কোনো মিথবেত্তাই যেমন, স্যার জেমস ফ্রেজার আরিয়াগার কথা যিনি কয়েকবারই উল্লেখ করেছেন – কখনো প্রশ্ন করেননি কেন কাটাঠোঁট এবং যমজ ব্যক্তিদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে একইভাবে দেখা হয়ে

থাকে। আমার কাছে সমস্যাটির মূল প্রশ্নগুলো এরকম: কাটাঠোঁট কেন? যমজ কী কারণে? কেন যমজ আর কাটাঠোঁট একই সঙ্গে?

সমস্যাটির সমাধানের জন্য দক্ষিণ আমেরিকা পেরিয়ে যেতে হবে উত্তর আমেরিকায়, যেটা মাঝে মাঝে আমাদেরকে করতে হয় কারণ, উত্তর আমেরিকার একটি মিথই আমাদেরকে দক্ষিণ আমেরিকার মিথটির এইসব ধাঁধা সম্পর্কে সূত্র দেবে। আমার এ কৌশলের অনেকে খুব সমালোচনা করেন কারণ তাঁদের দাবি একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মিথগুলো কেবল সেই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-কাঠামোর মধ্যেই বোঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এর উত্তরে আমার কিছু কথা বলার ছিল।

প্রথমত, আমার কাছে যেটা বাস্তব বলে মনে হয়, যা তথাকথিত বার্কলে স্কুলে দেখিয়েওছে, কলাম্বাসের আগে উভয় আমেরিকার লোকসংখ্যা যত মনে করা হয় তার চাইতে অনেক বেশী ছিল। যেহেতু লোকসংখ্যা বেশী ছিল সেহেতু নিশ্চিতভাবেই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের সান্নিধ্যে কিছুটা হলেও এসেছিল। ফলে বিশ্বাস, রীতি আর প্রথা বলা যেতে পারে তাদের পরস্পরের মধ্যে চুঁইয়ে গিয়েছিল। যে কোনো জনগোষ্ঠীই প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীতে কী ঘটে যাচ্ছে সে বিষয়ে কিছুটা হলেও অবগত থাকে। দ্বিতীয়ত, যে মিথগুলো আমরা এখানে আলোচনা করছি তারা কেবলমাত্র একদিকে দক্ষিণ আমেরিকার এক কোণায় পেরুতে এবং উত্তর আমেরিকার কানাডায় বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করছিল তা না, বরং আমরা এই মিথগুলো এই দুই এলাকার মাঝামাঝি জনগোষ্ঠীগুলোয় উপর্যুপরি খুঁজে পাই। বাস্তবতা হচ্ছে এগুলো মাহাদেশদু'টির বিভিন্ন কোণায় জন্ম নেওয়া বিচ্ছিন্ন মিথ নয়, এগুলো নিখিল মার্কিন মিথ।

ইউরোপীয়রা প্রথম যখন ব্রাজিলের প্রাচীন উপকূলীয় বাসিন্দা টুপিনামবাদের আবিষ্কার করে সেসময় তাদের মধ্যে এক মিথ চালু ছিল। একটি মেয়েকে নিয়ে তৈরী এই মিথটি পেরুর ইন্ডিয়ানদের মাঝেও প্রচলিত ছিল। মেয়েটিকে একটি গরিব লোক ফুসলায়। মিথটির এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে ভাল বর্ণনা যেটা ষোড়শ শতকে ফরাসী সাধু আঁদ্রে থেভে দিয়ে গেছেন তাতে দেখা যায় – মেয়েটি দু'টি যমজ শিশু জন্ম দেয়, একটির বাবা তার বৈধ স্বামী, অন্যটির বাবা তার অসাধু প্রেমিকটি। মেয়েটি যখন তার ভবিষ্যৎ স্বামীর (যে একজন দেবতা) সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল তখন পথে

এই অসাধু লোকটি তাকে বোঝায় যে আসলে সে-ই তার হবু স্বামী-দেবতা। ফলে সে লোকটির দ্বারা গর্ভবতী হল। পরে সে যখন সেই আসল দেবতাকে খুঁজে পেল তখন তার কাছ থেকেও সন্তান লাভ করল এবং যমজ সন্তান জন্ম দিল। তবে যেহেতু এই যমজ দু'টি ভিন্ন বাবার সন্তান সেহেতু তাদের চরিত্রও ছিল বিপরীত। একজন ছিল সাহসী, অন্যজন ভীতু; একজন ইন্ডিয়ানদের রক্ষক তো অন্যজন সাদা মানুষকে রক্ষা করে; একজন সর্বদা ইন্ডিয়ানদের ভাল করে, অন্য জন বয়ে আনে দুর্ভাগ্য।

উত্তর আমেরিকার, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার উত্তর-পশ্চিমে আমরা আবার সেই একই মিথের দেখা পাই। তবে কানাডায় মিথটির যে সংস্করণটি পাওয়া যায়, দক্ষিণ আমেরিকান সংস্করণটির সাথে তার তুলনা করলে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ দেখি। যেমন, রকি পর্বতের অধিবাসী কুটেনেদের মতে মেয়েটির যমজশিশু হয় একজনের ঔরসেই। এই যমজদু'টোর একটি পরে হয় সূর্য, আরেকজন চাঁদ। অন্যদিকে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সালিশ ভাষাগোষ্ঠীর কিছু ইন্ডিয়ান জাতির মধ্যে প্রচলিত মিথটি দু'বোনের কথা বলছে যারা ঠিক একইভাবে দুই ব্যক্তির ছলনার শিকার হয়ে দু'টি পুত্র জন্ম দেয়। এক্ষেত্রে শিশু যমজ ছিল না কারণ স্পষ্টতই তারা দুই মায়ের সন্তান। কিন্তু অন্তত নৈতিক ও মানসিক দিক থেকে একই ধরনের পরিস্থিতিতে জন্ম নেওয়ায় এরা ছিল যমজের মতই।

আমি যা দেখাতে চাই সেজন্য মিথটির এই বিভিন্ন ধরন গোচরে আনাটা গুরুত্বপূর্ণ। মিথটি সালিশদের মধ্যে এসে যে রূপ লাভ করেছে সেটা এর কেন্দ্রীয় চরিত্রের যমজ ব্যাপারটিকে দুর্বল করে দেয় কারণ যমজদুটো আর আপন ভাই নয় - খালাতো ভাই। যে পরিস্থিতিতে এদের জন্ম সেটা প্রায় সমান্তরাল একই কৌশলের কারণে। তবে এখানেও মূল উদ্দেশ্য ঠিকই থাকে কারণ মিথটির কোনো ব্যাখ্যাতেই হিরোদু'টি প্রকৃত যমজ নয়; সবগুলোতেই তাদের বাবারা ছিল ভিন্ন চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের, এমন কি দক্ষিণ আমেরিকান সংস্করণটিতেও এই বাবাদের চরিত্র ছিল বিপরীত যা তাদের সন্তানদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

সুতরাং আমরা হয়ত এভাবে বলতে পারি যে সবগুলো ক্ষেত্রেই যমজ আখ্যা দেয়া হচ্ছে বা যমজ বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে (যেমন কুটেনে সংস্করণের

বেলায়) এমন শিশুরা পরে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় যেগুলো তাদের যমজত্ব খারিজ করে। এবং দুই প্রকৃত অথবা প্রায় যমজের এই স্বাতন্ত্র্যই উত্তর ও দক্ষিণ উভয় আমেরিকায় বিরাজিত এই মিথের সবকটি ব্যাখ্যার মূল বৈশিষ্ট্য।

মিথটির সালিশীয় ব্যাখ্যাটিতে একটি খুব চিত্তাকর্ষক ব্যাপার রয়েছে যা খুব গুরুত্বপূর্ণও বটে। আপনাদের হয়ত মনে আছে এদের মিথটিতে আক্ষরিক অর্থে কোনো যমজের উল্লেখ নেই কারণ এখানে দুই বোন নিজেদের জন্য বর খুঁজতে বেরিয়েছিল। তাদের দাদী তাদেরকে হবু স্বামীদের কী কী বৈশিষ্ট্য দেখে চিনতে হবে তা বুঝিয়ে দেয়। মেয়েদু'টি তখন সেই কপট লোকগুলোর পাল্লায় পড়ে যারা তাদেরকে বোঝায় যে তারাই সেই হবু স্বামী। ফলে সেই রাত তারা লোকদু'টোর কুটিরে থাকে এবং পরে প্রত্যেকে এক একটি পুত্রের জন্ম দেয়।

ঠগদু'টোর বাড়ীতে সেই দুর্ভাগ্যজনক রাতের পর বড় বোন ছোটকে ছেড়ে তার দাদীর সাথে দেখা করতে যায়। তাদের দাদী একটি মকর অর্থাৎ পাহাড়ী ছাগল। অন্যদিকে সে আবার যাদুকরীও। নাতনী আসার কথা আগাম জানতে পেরে সে খরগোশকে পাঠায় তাকে এগিয়ে নিয়ে আসতে। খরগোশ তখন পথের মাঝখানে পড়ে থাকা একটা কাঠের গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। এদিকে মেয়েটি যখন গুঁড়িটা পার হয়ে যায়, খরগোশ তার যোনিপথ দেখে এবং অশ্লীল মন্তব্য ছোঁড়ে। ক্রুদ্ধ মেয়েটি তখন লাঠি দিয়ে আঘাত করলে খরগোশের নাক দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তখন থেকেই খরগোশ জাতীয় প্রাণীর নাক এবং ওপরের ঠোঁট দ্বিখণ্ডিত থাকে, এবং মানুষের মধ্যে যাদের এ ধরনের ঠোঁট থাকে তাদের এই বৈশিষ্ট্যকে ইংরেজীতে হেয়ারলিপ্স (harelips) বলে।

অন্য কথায়, বড় বোনটিই প্রথম প্রাণীটির দেহ বিভক্ত করে। যদি এই খণ্ডন নাকে শেষ না হয়ে সারা শরীরে, লেজ পর্যন্ত ঘটত তাহলে একটি খরগোশ দু'টিতে পরিণত হত অর্থাৎ জন্ম হত একেবারে একইরকম দেখতে দু'টি প্রাণীর কারণ তারা একই প্রাণীর দুই অংশ। এ পর্যায়ে দেখা যাক আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা যমজদের জন্মের ব্যাপারে কী ধারণা পোষণ করে। এক্ষেত্রে একটা সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে, শরীরের ভেতরেই তরল দু'ভাগে ভাগ

হয়ে পরে তা কঠিন হয়ে মানবদেহের রূপ নেয়। এ কারণেই কিছু উত্তর আমেরিকান ইন্ডিয়ান জাতির মধ্যে গর্ভবতী মহিলাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় জোরে পাশ ফিরতে বারণ করা হয়। কারণ তাদের বিশ্বাস জোরে পাশ ফিরলে গর্ভের রস দু'ভাগে ভাগ হয়ে যমজের জন্ম দিতে পারে।

এখানে ভ্যানকুভার দ্বীপের কোয়াকিউটল্ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত একটি মিথ উল্লেখ করা যাক। ঠোঁট কাটা ছিল বলে একটা ছোট মেয়েকে সবাই ঘেন্না করত। একদিন মানুষখেকো এক ডাইনী হঠাৎ এসে সব ছোট ছেলেমেয়েকে চুরি করে নিয়ে যায় যার মধ্যে ছিল সেই কাটাঠোঁট মেয়েটিও।। ডাইনীটি বাচ্চাদেরকে একটা ঝুড়িতে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দেয়।। মেয়েটিকে প্রথমেই ধরেছিল বলে সে ছিল ঝুড়ির নীচে। সে তখন সৈকতে কুড়িয়ে পাওয়া একটা ঝিনুক দিয়ে ঝুড়ি ফাঁক করে লাফিয়ে পালিয়ে যায়।। ঝুড়িটা বুড়ীর পিঠে, মেয়েটা তাই সহজেই বুড়ীর চোখ এড়িয়ে লাফিয়ে পালাতে পেরেছিল। লাফিয়ে পড়ার সময় মেয়েটির পা ছিল নীচের দিকে।

কাটাঠোঁট মেয়েটির পালানোর সময়ের এই অবস্থা আগে উল্লেখ করা মিথটির খরগোশের মত: নায়িকার পথের ওপর পড়ে থাকা কাঠের গুঁড়ির নীচে ঘাপটি মেরে থাকার সময় তার অবস্থা এরকম যেন সে মেয়েটির গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং জন্ম মুহূর্তে তার পা রয়েছে আগে। সুতরাং এই সবগুলো মিথে আমরা একদিকে যমজ, অন্যদিকে পা আগে রেখে জন্ম নেওয়া বা একই ধরনের রূপকাবস্থা, এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করি। এতে করে ফাদার আরিয়াগা, যাঁর বর্ণিত মিথ দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম তাঁর উপস্থাপিত যমজ, কাটাঠোঁট আর পা সামনে রেখে জন্মের ধাঁধাটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

কাটাঠোঁটকে উপক্রমিক যমজতা মনে করার এই প্রবণতা যেসব নৃতাত্ত্বিক বিশেষ করে কানাডাতে কাজ করছেন তাঁদের একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে: ওজিবওয়া ইন্ডিয়ান এবং এলগংকিয়ান ভাষাভাষী রেড ইন্ডিয়ানরা কেন খরগোশকে তাদের সর্ব্বোচ্চ দেবতা মনে করে? এ সম্পর্কে কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে: খরগোশ তাদের খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, খরগোশ খুব জোরে দৌড়াতে পারে যা এর ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচায়ক এবং যা ইন্ডিয়ানদের হওয়া উচিত বলে মনে করা হয় ইত্যাদি। এসব ব্যাখ্যার

কোনোটাই তেমন গ্রহণযোগ্য না। যদি আমার এই ব্যাখ্যাগুলো ঠিক হয়ে থাকে, এটা জোরের সাথে বলা যাবে যে -

১. খরগোশ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে খরগোশই অন্যদের চেয়ে বড়, প্রত্যুৎপন্নমতি, মানুষের বেশী দরকারী, সুতরাং একে এই জাতীয় প্রাণীদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

২. সব খরগোশ জাতীয় প্রাণী একই ধরনের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা তাদেরকে উপক্রমিক যমজ বলে তুলে ধরে কারণ তারা অংশত বিভক্ত।

যখন কোনো মায়ের গর্ভে দুই বা তার বেশী শিশু থাকে তখন এসব মিথ অনুযায়ী, মাতৃগর্ভে একটা সঙ্ঘাতপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিশুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে কে আগে মায়ের পেট থেকে বেরোবে সেই নিয়ে। এদের একজন যে কিনা সবচাইতে পাজি, তাড়াতাড়ি জন্মানোর জন্য সহজ পথটি নিতে দ্বিধা করে না - সবাই যেভাবে জন্মায় সে পথে না গিয়ে সে মায়ের শরীর ভাগ করে বেরিয়ে আসে।

আমি মনে করি এটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে কেন আগে পা নিয়ে বের হওয়া শিশুদেরকে যমজের সাথে এক করে দেখা হয়। কারণ আগে জন্ম নেওয়ার তাড়াতেই শিশুটি মায়ের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তার শরীর ভাগ করে বেরিয়ে আসে।। যমজ আর পা আগে রেখে জন্ম নেওয়া শিশু উভয়েই প্রসবের কাজটিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। অন্য কথায় এটাকে শিশুটির জন্য বীরোচিত প্রসবও বলা যেতে পারে কারণ জন্ম নেওয়ার উদ্যোগটা সেই-ই নেয় যদিও অনেক সময় মায়ের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, কিন্তু এভাবেই সে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পাট শেষ করে। এটাই ব্যাখ্যা করে কেন কিছু কিছু ট্রাইবে জন্মের সাথে সাথেই যমজদের এবং পা আগে রেখে জন্মানো শিশুদের মেরে ফেলা হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে সব আমেরিকান মিথলজিতেই এবং বলা যেতে পারে পৃথিবীর সব মিথলজিতেই আমরা সেইসব দেবতা ও অলৌকিকের দেখা পাই যারা ওপরের ঈশ্বর এবং নীচের মানবলোকের মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করেন। এঁরা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হনঃ মেসিয়াহ বা ঈশ্বরের দূতের মত চরিত্র বা স্বর্গীয় যমজ ইত্যাদি। আমরা দেখি আলগংকিয়ান মিথলজিতে খরগোশের স্থান মেসিয়াহ অর্থাৎ অনন্য মধ্যবর্তী

এবং স্বর্গীয় যমজের মাঝামাঝি। সে যমজ না, কিন্তু প্রায় যমজ। তারপরও সে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কিন্তু তার ঠোঁট কাটা। সে যমজ হওয়ার মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে।

এটাই ব্যাখ্যা করে কেন এই মিথলজিতে দেবতা হিসাবে খরগোশের চরিত্র এতটা ধোঁয়াটে যা বর্ণনাকারী ও নৃতাত্ত্বিকদের ভীষণ ভুগিয়েছে। কখনো সে খুব প্রজ্ঞাবান একজন দেবতা যার কাঁধে মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা রক্ষার মত গুরুদায়িত্ব, আবার কখনো সে হাস্যকর এক ভাঁড়ের চরিত্রে যে কেবলই এক ঝামেলা থেকে আরেক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। এটা আরো ব্যাখ্যা দেয় আলগংকিয়ান ইন্ডিয়ানরা কেন খরগোশকে ভেবেছেন যুগপৎ দু'ভাবে: ক. মানুষের কল্যাণে নিবেদিত এক দেবতা ও খ. যমজ, যার একটি ভাল অন্যটি খারাপ। তাঁরা ভেবেছেন পরস্পর বিপরীত চরিত্র বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি দ্বিধাবিভক্ত বা যমজদের মধ্যে না হলেও, এভাবে একই ব্যক্তির মধ্যে বিরাজ করতে পারে।

[প্রবন্ধটির ইংরেজী নাম : Harelips and Twins : The Splitting of a Myth]

টীকা

১. Incipient twinhood—উপক্রমিক যমজতা

২. এই লেখায় লেভি-স্ত্রস যেসব রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসী জাতির নাম উল্লেখ করেছেন: টুপিনামবা (Tupinambas), কুটেনে (Kootenay), সালিশীয় ভাষাভাষী থম্পসন ইন্ডিয়ান এবং ওকানাগান (Thompson Indians and Okanagan of Shalish linguistic stock), কোয়াকিউটল (Kwakiutl Indians) ওজিবোয়া (Ojibwa Indians), আলগংকিয়ান ভাষাভাষী ইন্ডিয়ান (Algonkian speaking Indians)।

চতুর্থ অধ্যায়

মিথ যখন ইতিহাস হয়ে ওঠে

বিষয়টি মিথবেত্তাদের উপর্যুপরি দু'টি সমস্যায় ফেলে। প্রথমটা তাত্ত্বিক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উত্তর ও দক্ষিণ দুই আমেরিকাতেই মিথ বিষয়ে দু'ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিকরা কখনো কিছু কিছু মিথ উদ্ধার করেন যেগুলোকে ছেঁড়া ছেঁড়া, আংশিক বলাই ভাল। এসব আখ্যানে বিভিন্ন গল্পকে একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেগুলোর একটার সাথে আরেকটার তেমন পরিষ্কার যোগ নেই। অন্যদিকে, কিছু কিছু জায়গায় মিথগুলো খুব সাজানো গোছানো অবস্থায় পাই। যেমন, কলাম্বিয়ার ভপ্‌স এলাকায় পাওয়া মিথগুলো। এগুলো খুব গোছানো ও অধ্যায় ভাগ করা এবং অধ্যায়গুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির রীতিমতো যুক্তিসিদ্ধ সম্পর্ক।

এর পরে প্রশ্ন আসে: সংগ্রহ বলতে আমরা আসলে কী বুঝি? সংগ্রহ বলতে দু'টি জিনিস বোঝা যেতে পারে। এক, একটা গোছানো উপাখ্যান যেটা কিছুটা 'সাগা'র মত হতে পারে। এটা মিথের আদি অবস্থা। দুই, ছাড়া ছাড়া গল্প। এটা হয় ভালভাবে সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে মিথটি যখন অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। আমাদের হাতে তখন গোটা মিথটির বদলে এর বিভিন্ন উপাদান ছাড়া ছাড়া ভাবে এসে পড়ে।

অথবা এমনও হতে পারে ছাড়া ছাড়া ভাবটাই মিথটির আদি অবস্থা। পরে ওই জাতি বা এলাকার জ্ঞানী ব্যক্তি বা দার্শনিক বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলোকে একটা ধারাবাহিক রূপ দেন। তবে এসব জ্ঞানী ব্যক্তি সব সমাজে থাকেন না। এঁদের পাওয়া যায় নির্দিষ্ট কিছু সমাজে। বাইবেল নিয়েও আমাদের ঠিক

একইরকম সমস্যা আছে। আমাদের মনে হয় বাইবেলের বিভিন্ন উপাদান আদিতে ছাড়া ছাড়া অবস্থাতেই ছিল। পরে জ্ঞানী দার্শনিকরা এগুলোকে পরপর সাজিয়ে একটা ধারাবাহিক চেহারা দিয়েছেন। নৃতাত্ত্বিকদের যে বিষয়টা খতিয়ে দেখা খুবই জরুরী: তাঁরা যেসব মৌখিক ভাষাসম্পন্ন অর্থাৎ যাদের লিখিত ভাষা বা বর্ণমালা নেই এমন জাতির সংস্পর্শে এসেছেন তাদের মিথের ব্যাপারটাও বাইবেলের মত কিনা।

এই দ্বিতীয় সমস্যার প্রকৃতি কিছুটা তাত্ত্বিক হলেও তার বাস্তব ভিত্তি অস্বীকার করা যায় না। অতীতে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষ বা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মিথের বিভিন্ন উপাদান নৃতাত্ত্বিকরাই সংগ্রহ করতেন। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন বাইরে থেকে আসা মানুষ। কোনো কোনো এলাকায় যেমন কানাডাতে অবশ্য তাঁদের স্থানীয় সহযোগীরা ছিলেন। এখানে ফ্রান্য বোয়ার ঘটনাটা উল্লেখ করার মত। তাঁর জর্জ হান্ট নামে একজন সহযোগী ছিলেন যিনি জাতিতে ছিলেন কোয়াকিউট্‌ল। (অবশ্য জর্জ হান্ট পুরোপুরি কোয়াকিউট্‌ল ছিলেন না, তাঁর বাবা ছিলেন স্কটিশ ও মা ছিলেন ট্‌লিংগিট জাতির। জর্জ বড় হয়েছিলেন কোয়াকিউট্‌লদের মধ্যে, বিয়ে করেছিলেন কোয়াকিউট্‌ল মেয়ে এবং তাদের সংস্কৃতিকেই নিজের করে নিয়েছিলেন।) ট্‌সিমশিয়ান জাতির মধ্যে কাজ করতে গিয়ে বোয়া পেয়েছিলেন হেনরি টেইটকে। হেনরি একজন শিক্ষিত ট্‌সিমশিয়ান ছিলেন। নৃতাত্ত্বিক মারিয়াস বারবিউ পেয়েছিলেন উইলিয়াম বেনিয়ানকে। উইলিয়ামও ছিলেন শিক্ষিত ট্‌সিমশিয়ান। অর্থাৎ শুরু থেকেই নৃতাত্ত্বিকরা যে জাতিতে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে থেকেই একজন দু'জনকে সহকারী হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে টেইট, হান্টার বা বেনিয়ান সকলেই নৃতাত্ত্বিকদের তত্ত্বাবধানে কাজ করেছিলেন। এভাবে তাঁরা নিজেরাও পরিণত হয়েছিলেন নৃতাত্ত্বিকে। যদিও তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ সব কিংবদন্তী আর ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, কিন্তু একই সাথে অন্যান্য পরিবার ও গোষ্ঠী থেকেও কিংবদন্তী ও তথ্য আহরণে ছিলেন আগ্রহী।

ট্‌সিমশিয়ানদের ওপর সংগৃহীত তথ্য সমবেত হয়েছে বোয়া ও টেইটের লেখা *ট্‌সিমশিয়ান মিথলজি* বইতে। এছাড়া হান্টের সংগৃহীত কোয়াকিউট্‌ল টেক্সটও সম্পাদনা, প্রকাশ ও অনুবাদ করেছেন বোয়া। আমরা যখন রেড

ইন্ডিয়ান মিথলজির এই বিপুল সম্ভারের দিকে তাকাই তখন তথ্য সমাবেশের প্রায় একই ধরন চোখে না পড়ে যায় না। এর কারণ এগুলোর সন্নিবেশ ঘটেছে নৃতাত্ত্বিকদের হাতে। যেমন, প্রথমে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্যা ও সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য, পরে, অনেক পরে এসেছে অন্যান্য কিংবদন্তী এবং পারিবারিক ইতিহাস।

নৃতাত্ত্বিকরা যা শুরু করেছিলেন তা এখন হাতে তুলে নিয়েছেন রেড ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর নিজেদের কর্মীরা। কখনো কখনো এর উদ্দেশ্য থাকে স্কুলে রেড ইন্ডিয়ান বাচ্চাদেরকে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং নিজেদের কিংবদন্তীর সাথে পরিচয় ঘটানো। আমি যতদূর বুঝি কাজটা খুবই দরকারী। তাছাড়া এর পেছনে সাদাদের বিপরীতে রেড ইন্ডিয়ানদের নিজেদের দাবী যেমন ভূমির দাবী, রাজনৈতিক দাবী ইত্যাদি ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ও থাকে।

একটা বিষয় দেখা ভীষণ জরুরী। সেটা হচ্ছে বাইরে থেকে আসা কারো দ্বারা কিংবদন্তী, প্রথা ইত্যাদি সংগ্রহ এবং কোনো জাতির নিজেদের মধ্যে থেকেই কারো দ্বারা এসব সংগ্রহ – এই দুইয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কিনা যদিও নিজেদের লোকজন যখন এ কাজটি করেন তখন তাকেও বাইরে থেকে সংগ্রহ বলেই মনে হয়। এদিক থেকে কানাডাকে ভাগ্যবান বলতে হবে কারণ সেখানে রেড ইন্ডিয়ান বিশেষজ্ঞ নিজেরাই সংগ্রহ ও প্রকাশনার কাজটি করেছেন। সেখানে অনেক আগেই এটা শুরু হয়েছে। পলিন জনসনের *লিজেন্ডস্ অব ভ্যানকুভার* (ভ্যানকুভারের কিংবদন্তী) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই বের হয়েছে। পরে আমরা পেয়েছি মারিয়াস বারবিউয়ের বইগুলো। বারবিউ অবশ্য কোনো দিক থেকেই রেড ইন্ডিয়ান ছিলেন না। তবে তিনি রেড ইন্ডিয়ানদের ঐতিহাসিক ও আধা-ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর রেড ইন্ডিয়ান বয়ানকারীদের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। সুতরাং বারবিউয়ের বইয়ের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এসব মিথলজি তাঁর নিজস্ব সংস্করণ।

এর চেয়ে অনেক বেশী মজার হচ্ছে *মেন অব মেডিক* (মেডিকের মানুষেরা)-এর মত বই। বইটা প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে কিটিমাটে। যতদূর বোঝা যায় *মেন অব মেডিক* হচ্ছে রেড ইন্ডিয়ান চিফ ওয়াল্টার রাইটের মুখে

শোনা কাহিনী। ওয়াল্টার রাইট স্কিনা নদীর মাঝামাঝি এলাকার একজন ট্সিমশিয়ান গোষ্ঠী প্রধান। তাঁর বলা এই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি এমন কি পেশাদার নৃতাত্ত্বিকও না। ইদানিংকালে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বই বের করেছেন আরেক ট্সিমশিয়ান প্রধান চিফ কেনেথ হ্যারিস, ১৯৭৪ সালে।

আমরা এসব সংগ্রহের ওপর তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। একদিকে থাকবে পেশাদার নৃতাত্ত্বিকদের সংগ্রহ করা উপাদান, অন্যদিকে থাকবে সরাসরি রেড ইন্ডিয়ানদের সংগৃহীত ও প্রকাশিত নিজেদের উপাদান। একদিক থেকে এগুলো ঠিক সংগৃহীত উপাদানও না। কারণ কয়েকটি পরিবার, গোষ্ঠী বা গোত্র, বা একাধিক বংশ থেকে আহরিত উপাদান নয় এসব। এই বই দু'টোতে আমরা যা পাই তা হচ্ছে একটি পরিবার বা গোত্রের ইতিহাস যা বস্তুত সেই পরিবার বা গোত্রেরই কেউ প্রকাশ করেছেন।

সমস্যা হচ্ছে, কোথায় মিথলজির শেষ এবং ইতিহাসের শুরুই বা কোথায়? এখানে আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিস্থিতিতে এই প্রশ্ন উঠেছে। এখানে কোনো আর্কাইভ নেই, নেই কোনো লিখিত ইতিহাস। আছে কেবল মুখে মুখে চলে আসা বিবরণ। ভার্বাল ট্রাডিশন। একই সাথে একেই ইতিহাস বলে দাবী করা হয়েছে।

আমরা এই দু'ধরনের ঐতিহ্যের তুলনা করতে পারি। স্কিনা নদীর মাঝামাঝি এলাকার প্রধান চিফ ওয়াল্টার রাইটের দেওয়া মৌখিক বিবরণ এবং স্কিনার উজানে হ্যাজেলটন এলাকায় এক রেড ইন্ডিয়ান পরিবারের প্রধান চিফ হ্যারিসের লেখা ও প্রকাশিত বিবরণ। এ দুইয়ের তুলনা করলে মিল ও অমিল দুটোই চোখে পড়বে। চিফ রাইটের বর্ণনায় যা পাওয়া যায় তাকে আমি বলি বিশৃঙ্খলার ইতিহাস। পুরো গল্পটা জুড়েই ব্যাখ্যা করা হয়েছে একটি গোত্র, বংশ বা একাধিক বংশগুচ্ছ ইতিহাসের পথে তাদের যাত্রা শুরু করার পর কী কারণে অনেক কঠিন পরীক্ষা পার হয়ে, অনেক সাফল্য ও ব্যর্থতার পর শেষে চূড়ান্ত ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এটা একটা চূড়ান্ত হতাশার গল্প, প্রকৃত অর্থেই ইতিহাসের কাছে হেরে যাওয়ার উপাখ্যান। অন্যদিকে চিফ হ্যারিসের দৃষ্টিকোণ একেবারেই ভিন্ন। তাঁর বইয়ে মূলত বর্ণনা করা হয়েছে ইতিহাসের গর্ভে কী করে একটা সামাজিক শৃঙ্খলা গড়ে উঠলো, যে শৃঙ্খলা এখনো

লুকিয়ে রয়েছে বিভিন্ন নাম, উপাধি এবং গোষ্ঠীগত ও সামাজিক সম্মানের মধ্যে। নিজের গোত্রে ও পরিবারে সম্মানের আসনে বসা এক ব্যক্তি নিজের চারপাশের সেই উত্তরাধিকার সংগ্রহ করেছেন। এ যেন ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরাকে বর্তমানের পর্দায় উপস্থাপন করা হচ্ছে যায় লক্ষ্য টুকরো টুকরো ঘটনা জুড়ে একটা সামগ্রিক শৃঙ্খলা স্থাপন যে শৃঙ্খলা এখনো ক্রিয়াশীল এবং যা আমরা বিভিন্ন পদবী ও কোনো কোনো ব্যক্তির জন্য রক্ষিত সামাজিক সম্মানের সূত্রে বুঝতে পারি।

দু'টি গল্পই, দু'টি বইই দারুণ উপভোগ্য, আক্ষরিক অর্থেই চমৎকার। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকদের আগ্রহ এমন ইতিহাস বর্ণনায় যেটা আমাদের নিজেদের ইতিহাস থেকে অনেক বেশী ভিন্ন, অনেক আলাদা। আমরা যে ইতিহাস লিখি সাধারণত তার ভিত্তি থাকে লিখিত দলিল। কিন্তু এই বইদু'টিতে আমরা যে ইতিহাস পাই তার কোনো লিখিত বিবরণ নেই বা যা আছে তা খুব সামান্য। আমি খুব অবাক হই এটা দেখে যে এই দুই ধরনের ইতিহাস বর্ণনাই শুরু হয় কোনো এক মিথিক সময় বা ঐতিহাসিক সময় (একে কী বলা যায় সেটা প্রত্নতাত্ত্বিকরাই ঠিক করবেন) থেকে। মিথ বা ইতিহাসের গভীর গর্ভে থাকা সেই সময়ে স্কিনা নদীর উজানে এক শহরের কাহিনী পাওয়া যায় যার নাম, বাববিউ লিখেছেন টেন্‌লাহাম। শহরের কাহিনী দু'টি বইতেই প্রায় এক: শহরটি ধ্বংস হয়েছিল এবং এরপর স্কিনার তীর ধরে শুরু হয়েছিল শহরের বাকি অধিবাসীদের এক মহাযাত্রা।

এই মহাযাত্রা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারত সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে ঘটনার বর্ণনা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এখানে ঘটনাসমাবেশ প্রায় এক কিন্তু খুঁটিনাটিগুলো নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভাষ্যমতে শুরুতে দু'টি গ্রাম বা দু'টি শহরের মধ্যে লড়াই বাধে। লড়াইয়ের কারণ ছিল পরকিয়া। কিন্তু কার পরকিয়া সেখানেই গোলমাল – কখনো বলা হচ্ছে স্বামী তার বউকে খুন করেছে, বা ভাইরা খুন করেছে বোনের প্রেমিককে বা স্বামী খুন করেছে বউকে কারণ বউয়ের পরকিয়া ছিল। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন ব্যাখ্যাই আছে অনেকগুলো। এর মূল কাঠামো একই, কিন্তু কাঠামোর ভিতরের জিনিস এক না। সুতরাং এটা একটা অনু-মিথ – যদি এভাবে বলা যায়। অনু-মিথ, কারণ এটা খুব ছোট, খুব নিবিড়, যদিও এর মধ্যে মিথের

সবকিছুই আছে। এর ক্রমরূপান্তরে আমরা সেটা বুঝতে পারি। একটা উপাদান যখন রূপান্তরিত হয় তখন অন্যান্য উপাদানগুলোকে সেভাবে সাজানোর দরকার পড়ে। এসব গোত্রকেন্দ্রিক গল্পের এদিকটাই আমার প্রথম আগ্রহ জাগায়।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা আমার আগ্রহ সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে ইতিহাস এখানে বার বার ফিরে আসে। একই ধরনের উপাদান বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় ব্যবহার করা হয়। যেমন, চিফ রাইটের বলা কিছু কিংবদন্তী এবং চিফ হ্যারিস বর্ণিত কিছু কিংবদন্তীতে আমরা একই ঘরনের ঘটনা দেখতে পাই। কিন্তু এঁদের দু'জনের বর্ণিত এসব ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র কোনোটাই এক ছিল না। অর্থাৎ ঘটনা এক হলেও সেটা একই এলাকায় ঘটেনি, একই লোকজনের জীবনে ঘটেনি বা ঘটেনি একই সময়ে।

এই বইগুলো পড়ে আমরা মিথলজি ও ইতিহাসের মধ্যেকার বৈপরিত্যের আরেকটি স্তর আবিষ্কার করি। এমনিতে আমরা ইতিহাস ও মিথলজিকে আলাদা করে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই বই দু'টি পড়ে যে বিষয়টি আমরা আবিষ্কার করি তা হচ্ছে মিথলজি ও ইতিহাসের মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিভাজন রেখা নেই। এবং এ দুইয়ের মাঝামাঝি আবার আরেকটি স্তর আছে। মিথলজি স্থির, আমরা মিথের উপাদানগুলোকে উপর্যুপরি ফিরে আসতে দেখি একটা বদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যে। এর বিপরীতে ইতিহাস একটি মুক্ত প্রক্রিয়া।

ইতিহাসের মুক্ত চরিত্রটি পোক্ত হয়েছে সেই সব অগুনতি পথে, যে পথ ধরে মিথিক্যাল বিভাগ বা ব্যাখ্যামূলক বিভাগগুলিকে পুনর্গঠিত করা যায়। বলা বাহুল্য এই মিথিক্যাল বিভাগ বা ব্যাখ্যামূলক বিভাগগুলি নিজেরাও মিথ. এ থেকে আমরা বুঝতে পারি এসব উপাদান যেহেতু সব গোষ্ঠী, দল, গোত্র ও বংশধারার সাধারণ উত্তরাধিকার সেহেতু একই উপাদান ব্যবহার করে প্রত্যেকেই নিজের নিজের জন্য একটি আদি কাহিনী তৈরী করেন।

পুরনো নৃতাত্ত্বিক বর্ণনায় সমস্যা হচ্ছে বহু ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ঐতিহ্য ও বিশ্বাস নিয়ে সেখানে জগাখিচুড়ি পাকানো হয়েছে। এর ফলে উপাদানগুলোর যে মৌলিক চরিত্র আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় সেটা হল এক এক ধরনের গল্প এক একটি নির্দিষ্ট দল, নির্দিষ্ট পরিবার, নির্দিষ্ট বংশধারা বা গোত্র সম্পর্কে বয়ান করে এবং সেই গোষ্ঠীটির সাফল্য বা ধ্বংসের পরিণতি সম্পর্কে একটা

ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। অথবা নিজেদের বর্তমান সমৃদ্ধিতে তাদের বৈধ অধিকার প্রমাণের চেষ্টা করে। কিংবা অতীতে তাদের যে সব অধিকার ছিল কিন্তু এখন নেই তা দাবী করে।

আমরা যখন নিজেদের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করি তখন কি সত্যি সত্যি বৈজ্ঞানিক কিছু করার চেষ্টা করি, নাকি আমরাও "খাঁটি ইতিহাস" রচনার আগ্রহে নিজেদের মিথলজিকে পায়ের নীচে স্থান দেই? কেউ নিজের গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মিথের সাথে আরেকটি পরিবার, বংশধারা বা গোত্রের একই ধরনের মিথের তুলনা করে যখন মিলের সাথে সাথে সাঙ্ঘাতিক অমিলও খুঁজে পায় তখন তার প্রতিক্রিয়া দেখে মজাই লাগে। এ ব্যাপারটা দুই আমেরিকা তো বটেই সারা পৃথিবীতেই হয়ে থাকে। আমরা মনে করি না যে দু'টি গল্প একই সময়ে সত্যি হতে পারে; তারপরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'টিই সত্যি বলে মেনে নেওয়া হয়। তবে এদের একটিকে আরেকটির চেয়ে বেশী সঠিক বলে ধরা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এদের মধ্যেকার অমিলগুলোকে সেভাবে হৃদয়ঙ্গম করা হয় না বলে দু'টি উপাখ্যানকেই সত্যি বলে ধরা হয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কিন্তু একেবারে খেয়াল করি না যে আমরা নিজেরা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের কারণে একই অবস্থায় আছি। শুধুমাত্র মৌলিকভাবে কাছাকাছি উপাদানের প্রতিই আমাদের মানোযোগ থাকে। তফাতগুলো আমরা সেভাবে নজর করি না যেটা তৈরী হয় মূলত ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকের তথ্য-উপাত্ত জড়ো করার ধরনে ও ব্যাখ্যায় ভিন্নতা থাকার কারণে।

সুতরাং আপনি যদি আমেরিকান বিপ্লব, কানাডায় ফ্রান্স-ইংল্যান্ড যুদ্ধ বা ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে ভিন্ন বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক ঘরানার দু'জন ঐতিহাসিকের বর্ণনা নেন, দেখবেন তাঁরা দু'জন যা বলেছেন তার মধ্যে খুব বেশী মিল নেই। এতে আপনি খুব একটা অবাকও হবেন না কারণ সেটাই স্বাভাবিক।

আমার যেটা মনে হয় সমসাময়িক আমেরিকান ইন্ডিয়ান লেখকরা তাঁদের যে অতীত আমাদের সামনে হাজির করছেন সেই ইতিহাস মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করে (শব্দটির সাধারণ অর্থেই বলছি), এই ইতিহাসকে কাল্পনিক বলে

উড়িয়ে না দিয়ে, প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ধার যেমন ইতিহাসে উল্লিখিত গ্রাম খুঁড়ে, বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে যোগাযোগগুলো উদ্ধার করে, তাদের মধ্যে কী কী মিল আছে এবং কোথায় কোথায় অমিল সেটা বের করে আমরা শেষমেষ ঐতিহাসিক বিজ্ঞান কী সে বিষয়ে আরো ভাল একটা ধারণায় পৌছাব।

আমাদের নিজেদের সমাজের ক্ষেত্রে, ইতিহাস মিথলজিকে প্রতিস্থাপিত করেছে, এবং মিথলজির দায়িত্বই পালন করছে – এই ধরণা থেকে আমি খুব একটা দূরে নই। অক্ষরহীন ও আর্কাইভহীন সমাজে মিথলজির দায়িত্ব হচ্ছে ভবিষ্যৎ যাতে বর্তমান ও অতীতের প্রতি যতটুকু সম্ভব (সঙ্গত কারণেই পুরোপুরি সম্ভব নয়) সৎ থাকে তা নিশ্চিত করা। আর আমাদের বেলায় ভবিষ্যৎ বর্তমান থেকে সবসময় আলাদা হবে, আরো আরো আলাদা যার কিছুটা নির্ভর করবে আমাদের রাজনৈতিক পছন্দের ওপর। তবে যাই হোক, আমাদের মাথায় মিথলজি ও ইতিহাসের মধ্যে যে ফাঁক রয়ে গেছে সেটা পূরণ হবে সেই ইতিহাস পাঠে যেখানে ইতিহাসকে মিথলজি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়নি, বরং যেখানে মিথলজিরই ধরতাই হয়ে উঠেছে ইতিহাস।

[প্রবন্ধটির ইংরেজী শিরোনাম: When Myth Becomes History]

টীকা

১. Clan—গোত্র
২. Saga—সাগা হচ্ছে মধ্যযুগে আইসল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোর বীর, পরিবার বা রাজাদের নিয়ে গদ্যে লিখিত গাথা। বারশ' শতক পর্যন্ত এগুলো মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত ছিল। সাগা লিখে রাখার কাজ এর পর থেকে শুরু হয়।
৩. Cosmology—সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্যা
৪. Cosmogony—সৃষ্টিতত্ত্ব

পঞ্চম অধ্যায়

মিথ ও সঙ্গীত

আমি *দ্য র এন্ড দ্য কুক্ড*-এর প্রথম অংশ এবং *L'Homme nu*-এর শেষাংশে মিথ ও সঙ্গীতের সম্পর্কের ওপর বেশ জোর দিয়ে লিখেছিলাম। ব্যাপারটা ইংরেজীভাষী দুনিয়ায় এবং এমন কি ফরাসীভাষীদের মধ্যেও বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। তাঁদের মতে মিথ ও সঙ্গীতের মধ্যেকার সম্পর্ক নেহাতই দৈব। আমার অনুভূতি অবশ্য একেবারেই অন্যরকম। আমি এদের মধ্যে বরং দু'ধরনের সম্পর্ক দেখতে পাই। একটি হচ্ছে সাদৃশ্যের সম্পর্ক, আরেকটি সম্পর্ক নিকটবর্তীতার - এ দু'টো আসলে একই ব্যাপার। তবে ব্যাপারটা আমি প্রথমেই বুঝতে পারিনি, প্রথমে আমাকে যেটা আকৃষ্ট করে সেটা হচ্ছে এদের সাদৃশ্য। ব্যাপারটি নীচে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

সাদৃশ্য বিষয়ে আমার মূল্য কথাটা হল একটি মিউজিক্যাল স্কোরে যেমন, সেরকম একটি মিথকেও ধারাবাহিক পারম্পর্য হিসাবে বোঝা সম্ভব নয়। এ কারণেই আমাদের একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, আমরা যদি সংবাদপত্র বা উপন্যাস পড়ার মত করে লাইন ধরে ধরে ডান থেকে বাঁয়ে কোনো মিথ পড়ার চেষ্টা করি, আমরা এটাকে বুঝতে পারব না। একে আমাদের বুঝতে হয় একটা সমগ্র হিসাবে, বুঝতে হয় যে, মিথটির অন্তর্নিহিত অর্থ এতে বর্ণিত ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব না, একে বুঝতে হলে এর ঘটনাগুচ্ছগুলো অনুসরণ করতে হবে, যদিও এই ঘটনাগুচ্ছ গল্পে বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়। ফলে মিথটিকে আমাদেরকে পড়তে হয় কমবেশী অর্কেস্ট্রাল স্কোরের মত করে: স্টেভের পরে স্টেভ না, বরং পুরো পৃষ্ঠাটিকে সামগ্রিকভাবে

অনুসরণ করে। আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হয় যে পৃষ্ঠার ওপর দিকে যা লেখা আছে তা তখনই অর্থময় হবে যখন একে পৃষ্ঠার নীচের দিকে যা আছে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যাবে। এভাবেই প্রথম স্টেভের অচ্ছেদ্য অংশ হবে দ্বিতীয় স্টেভ, এরপর তৃতীয় স্টেভ ইত্যাদি। অর্থাৎ শুধু বাঁ থেকে ডান দিকে পড়লে চলবে না, উল্লম্বভাবে অর্থাৎ ওপর থেকে নীচে পড়তে হবে। পুরো পৃষ্ঠাটিকে একটা সমগ্র হিসাবে বুঝতে হবে। মিথটিকে একমাত্র অর্কেস্ট্রাল স্কোর হিসাবে বিবেচনা করেই, স্টেভ ধরে ধরে রচিত এভাবে বিবেচনা করেই আমরা এর অর্থ বের করে আনতে সক্ষম হই।

কেন এবং কীভাবেই বা এটা ঘটে? আমার মতে এর দ্বিতীয় দিকটি অর্থাৎ এদের সাদৃশ্যের ব্যাপারটিই আমাদেরকে এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের যোগান দেয়। সত্যি বলতে কি, এটা হচ্ছে রেনেসাঁ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সেই সময় যখন মিথীয় চিন্তা ঠিক বিলুপ্ত বলব না, বরং বলা যেতে পারে পাশ্চাত্য চিন্তা-পদ্ধতিতে পেছনের সারিতে জায়গা নিয়েছে এবং মিথলজির কাঠামোয় বসানো গল্পের পরিবর্তে উপন্যাস রচিত হচ্ছে। ঠিক একই সময়ে আমরা সঙ্গীতের সেই মহান স্টাইলের উন্মেষ হতে দেখি যা ছিল সপ্তদশ বিশেষ করে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের স্বকীয়তায় ভরপুর।

ব্যাপারটা এরকম যে সঙ্গীত যেন এর ঐতিহ্যগত কাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ক্রিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগীয় ক্রিয়ার আধার হওয়ার উদ্দেশ্যে। একটা সময়ে মিথের জগতই ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগীয় ক্রিয়ার আধারস্বরূপ। মিথের জগৎ প্রায় সেই সময়েই নিজের এই ভূমিকা থেকে সরে এসেছিল। এখানে আমি কোন সঙ্গীতের কথা বলছি তা পরিষ্কার করা উচিত। যে কোনো সঙ্গীতই মিথের ভূমিকা পালন করতে শুরু করে ব্যাপারটা তা নয়। সতের শতকের প্রথম দিকে ফ্রেসকোবাল্ডির সাথে সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে সঙ্গীতের ধারা গড়ে ওঠে সেই ধারার কথাই আমি বলছি। আঠার শতকের প্রথম দিকে বাখ হয়ে এই ধারাটি সেই শতকেই মোজার্ট ও বিথোভেন এবং উনবিংশ শতকে ওয়াগনারে এসে পূর্ণতা পেয়েছিল।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে একটা জোরালো উদাহরণ দিচ্ছি। এটা আমি নিয়েছি ওয়াগনারের ট্রেট্রালজি থেকে। ট্রেট্রালজিটির নাম *দা রিং*। ট্রেট্রালজিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি থিম হচ্ছে 'ভালবাসা ত্যাগ'। সকলেই

জানে এই থিমটি প্রথম দৃশ্যমান হয় রাইনগোল্ডে যখন রাইনকুমারীরা আলবেরিখকে জানায় যে সে যদি চিরতরে ভালবাসা ত্যাগ করতে পারে তবেই সব সোনার মালিক হতে পারবে। যারপরনাই চমৎকার সাঙ্গীতিক এই মোটিফটি আলবেরিখের জন্য একটা প্রতীক হয়ে আসে এবং এটা সেই সময়ে আসে যখন আলবেরিখ বলে যে সে চিরকালের জন্য ভালবাসা ত্যাগ করে সোনারই অধিকারী হচ্ছে। ব্যাপারগুলো খুব পরিষ্কার ও সহজ; থিমটির আক্ষরিক তাৎপর্যই এটা: আলবেরিখ ভালবাসা ত্যাগ করছে।

দ্বিতীয় চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি আসে যখন এই থিমটি আবার দেখা দেয় ভালকাইরি-তে। কিন্তু ভালকাইরি-তে থিমটি এমন এক সময়ে আসে যখন এর আসার তাৎপর্য ঠিক বোঝা যায় না। ভালবাসা ত্যাগের থিমটি আবার আবির্ভূত হয় যখন সিগমুন্ড আবিষ্কার করে যে সিগলিন্ড তার বোন এবং একই সাথে তার প্রেমেও পড়ে অর্থাৎ তারা একটি নিষিদ্ধ সম্পর্কের সূচনা করতে যায় - ধন্যবাদ গাছের গভীরে পোঁতা সেই তরবারিটাকে সিগমুন্ড যেটাকে গাছের শরীর খুঁড়ে বের করে আনে। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় কেননা সিগমুন্ড তো ভালবাসা ত্যাগ করেনি বরং সে প্রথমবারের মত ভালবাসা কী-তা বুঝতে চলেছে তার বোন সিগলিন্ডের সাথে প্রেমের সুবাদে।

ভালবাসা ত্যাগের থিমটি আবার ফিরে আসে ভালকাইরি-তেই। শেষ অঙ্কে যখন দেবতাদের রাজা য়োটান কন্যা ব্রানহিল্ড-কে শাস্তি দিতে যাদুর ঘুমে পাঠিয়ে দেয় এবং তার চারদিকে আগুনের বলয় তৈরী করে। আমরা এখানে থিমটির ফিরে আসাকে সঙ্গত ভাবতে পারি কারণ য়োটান এখানে কন্যার প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করছে কিন্তু এটাকে খুব বিশ্বাসযোগ্য কারণ বলে আমাদের মনে হয় না। ফলে দেখতেই পাচ্ছেন মিথলজিতে যে সমস্যা, সেই একই সমস্যা দেখা দিচ্ছে সাঙ্গীতিক থিমেও, খুব লম্বা একটা গল্পের তিনটি বিভিন্ন মুহূর্তে যার আবির্ভাব ঘটে: প্রথমে শুরুতে, দ্বিতীয়বার মাঝে এবং তৃতীয়বার শেষে – তর্কের সুবিধার্থে *দ্য রিং*-এর প্রথম দু'টি অপেরায় আমরা আলোচনা সীমিত রেখেছি। যেটা আমি দেখাতে চেয়েছি, থিমটির পুনরাবির্ভাবের রহস্য বোঝার একমাত্র উপায় তিনটি ঘটনার একত্র উপস্থাপন, এদের একটিকে আরেকটির ওপর বসানো এবং এদেরকে একই ঘটনা হিসাবে

বিবেচনা করা সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখা যদিও আপাতদৃষ্টিতে এদের পারস্পরিক ভিন্নতা প্রচুর।

এরপর আমরা তিনটি ঘটনাতেই দেখি যে এদের প্রত্যেকটির বেলাতে একটা না একটা সম্পদের কথা বলা আছে যেটা কোনো এক জায়গা থেকে ছিঁড়ে বা উদ্ধার করে আনতে হয়। রাইন নদীর তলায় লুকানো সোনা, গাছের গভীরে পোঁতা তরবারি – গাছটা জীবন বা মহাবিশ্বের প্রতীকস্বরূপ; আর আছে ব্রানহিল্ড যাকে আগুন থেকে উদ্ধার করতে হয়। মিথটির পুনরাবির্ভাব আমাদেরকে যে বিষয়টি বুঝতে সচেষ্ট করে তা হচ্ছে সোনা, তরবারি ও ব্রানহিল্ড এগুলো এক এবং অদ্বিতীয়। সোনা, তরবারি ও নারী এগুলোর মধ্যে একটি একীকরণ প্রক্রিয়া বিদ্যমান যার জন্যই আসলে *টুইলাইট অব দ্য গড্‌স্*-এ ব্রানহিল্ডের মাধ্যমে সোনা আবার রাইন নদীতে ফিরে আসে; প্রকৃতপক্ষে এরা একই ছিল, শুধু এদেরকে দেখার পরিপ্রেক্ষিতটা ছিল আলাদা।

প্লটটির অন্যান্য দিকগুলিও পরিষ্কার করা হয়েছে। যেমন, আলবেরিখ যদিও ভালবাসা ত্যাগ করেছে কিন্তু পরবর্তীকালে সে সোনাঘটিত কারণেই হ্যাগেন নাম্নী এক মহিলাকে ভালবাসে যে তাকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দেয়। অন্যদিকে সিগমুন্ড তরবারি উদ্ধার করার সূত্রেই লাভ করে সিগফ্রিড অর্থাৎ তার পুত্রকে।

এভাবে থিমটির পুনরাবির্ভাব আমাদের এমন কিছুর ইঙ্গিত দেয় যা কবিতাগুলিতে কখনোই পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয়নি, আর সেটা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক হ্যাগেন ও বীর সিগফ্রিডের মধ্যে একটি দ্বৈত সম্পর্ক রয়েছে। তাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ একটি সমান্তরাল সম্পর্ক বিদ্যমান। এটাই ব্যাখ্যা করে কেন সিগফ্রিড ও হ্যাগেন বা সিগফ্রিড প্রথমে নিজে ও তারপর হ্যাগেনের ছদ্মবেশে গল্পের ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে ব্রানহিল্ডকে জয় করে।

এভাবে আমি আরো অনেক দূর যেতে পারতাম তবে যে উদাহরণগুলো দিলাম সেগুলোই হয়ত মিথের বিশ্লেষণ ও সঙ্গীত অনুধাবন এ দু'য়ের পদ্ধতিগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট। যখন আমরা সঙ্গীত শুনি তখন আমরা আসলে এমন কিছু শুনি যা একটি শুরু থেকে একটা শেষের দিকে যাত্রা করেছে এবং যা সময়ের সাথে সাথে বিকাশমান। একটি সিম্ফনি শুনুন: এর শুরু আছে, মধ্যবর্তী অবস্থা আছে, শেষ আছে, কিন্তু সবসময় আগের মুহূর্তে

কী শুনেছি আর এখন কী শুনছি এই দুইয়ের সংযোগ সাধন করতে না পারলে এবং পুরো সিম্ফনিটির সামগ্রিকতা সম্পর্কে সচেতন না থাকলে আপনি এর কোনো মজাই পাবেন না। যদি থিম ও ভ্যারিয়েশন, সঙ্গীতের এই দুটি ফর্মুলা নেন তবে দেখবেন আপনি সঙ্গীতটি ধারণ ও অনুভব করতে পারছেন শুধু যখন প্রত্যেক ভ্যারিয়েশনের জন্য প্রথমে যে থিম শুনেছেন সেটা মাথায় রাখতে পারেন। প্রত্যেক ভ্যারিয়েশনের একটা নিজস্ব সৌরভ আছে যেটা আরো বোঝা যায় যদি অবচেতনে আপনি আগের ভ্যারিয়েশনের ওপর পরেরটিকে বসাতে পারেন।

এভাবে মিথ ও সঙ্গীত দু'টি ক্ষেত্রেই শ্রোতার মনে একটি অবিরত পুনর্গঠন চলতে থাকে। এটা শুধুই একটি বৈশ্বিক সাদৃশ্য। ব্যাপারটা ঠিক এরকম যে সঙ্গীত যখন কোনো কাঠামো উদ্ভাবন করে সেটা ঠিক উদ্ভাবন হয় না, সেটা হয় পুনরাবিষ্কার কারণ সেই কাঠামোটা ইতিমধ্যেই মিথের স্তরে বিরাজ করছিল।

উদাহরণ হিসাবে ফিউগের কথা বলা যেতে পারে। ফিউগ নামে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যে প্রকারটি বাখের সময়ে ধ্রুপদী সঙ্গীতের মাত্রা পায় আশ্চর্যজনক-ভাবে সেটি নির্দিষ্ট কিছু মিথের একেবারে জীবন্ত প্রতিফলন বিশেষ করে যে সব মিথে দু'টি বা দুই দল চরিত্র রয়েছে। ধরা যাক এদের একটি ভাল, আরেকটি খারাপ যদিও এ ধরনের বিভাজন অতি সরলীকরণের পর্যায়ে পড়ে। মিথের গল্পটা হল এক দল আরেক দলের কাছ থেকে পালাচ্ছে, ফলে এখানে ধাওয়া করার একটা ব্যাপার আছে, কখনো 'ক' দল 'খ' দলের সাথে মিলিত হয়, কখনো 'খ' দল পালায় যার সবই ফিউগে পাওয়া যায়। আমরা ফরাসীতে যাকে 'le sujet et la re`ponse' বলে থাকি এখানে তাই ঘটছে। এই বিরোধ/বৈপরীত্য বা প্রতিসুর পুরো গল্প জুড়ে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না দু'টি দলের মধ্যে পুরোপুরি গুবলেট পাকিয়ে যায় – এই অবস্থাটা ফিউগের স্ট্রেটার মত। শেষে চূড়ান্ত সমাধান বা ক্লাইম্যাক্স আসে দুই নীতির সমন্বয়ের প্রস্তাবনার মধ্যে দিয়ে পুরো মিথ জুড়েই যার বিরোধিতা চলে আসছিল। এই দ্বন্দ্ব অনেক কিছুর মধ্যে হতে পারে, উর্ধ্বলোক ও নিম্নলোকের শক্তিদের মধ্যে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বা হতে পারে সূর্য ও পাতালপুরীর শক্তিদের মধ্যে ইত্যাদি। মিলনের ব্যাপারে মিথে যে সমাধান দেওয়া হয়েছে কাঠামোর দিক

থেকে তার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কর্ডের যা সঙ্গীতটির শেষ টানে কারণ এখানেও বিপরীত দুই পক্ষের মিলন ঘটানো হয় এবং সেটা ঘটে একেবারে শেষে। এছাড়া আমরা সোনাটা, সিম্ফনি, রন্‌ডো, টোক্যাটা বা পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের যে কোনো কাঠামোর সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ মিথ দেখাতে পারি যে কাঠামোগুলো সঙ্গীত নিজে থেকে উদ্ভাবন করেনি বরং মিথের কাঠামো থেকেই অবচেতনভাবে ধার করেছে।

এখানে আপনাদের একটা ছোট্ট গল্প বলি। *দ্য র এন্ড দ্য কুক্‌ড* লেখার সময় ঠিক করলাম বইটার প্রত্যেক অধ্যায়ের নাম সোনাটা, রন্‌ডো ইত্যাদি সঙ্গীতের এক এক প্রকারের নামে রাখব। সেসময় আমি এমন একটা মিথ পেলাম যার কাঠামোর ধরন ভালভাবে বুঝতে পারলেও একই কাঠামোর সঙ্গীত খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। শেষে আমার বন্ধু কম্পোজার রেনে লিবোউইট্‌জ-কে সমস্যাটা জানালাম। তাঁকে মিথটির কাঠামোটা বললাম যেটা ছিল এরকম: প্রথমে একেবারে ভিন্ন দুই গল্প যেগুলোর একটির সাথে আরেকটির দৃশ্যত কোনো সম্পর্ক নেই, সময়ের সাথে সাথে এরা পরস্পরের দিকে আগাতে থাকে ও একটা সময়ে এসে একীভূত হয়ে একটিমাত্র থিমে পরিণত হয়। জানতে চাইলাম এ ধরনের কাঠামোর সঙ্গীতকে কী বলে। তিনি বেশ ভেবেটেবে জানালেন সঙ্গীতের পুরো ইতিহাসেই এ ধরনের কাঠামোর সঙ্গীত আছে বলে তাঁর জানা নেই। তাই এর কোনো নামও নেই। তবে রেনে বললেন যে এ ধরনের কাঠামোর সঙ্গীত অবশ্যই সম্ভব। কয়েক হপ্তা পর রেনে আমাকে তাঁর নিজের রচিত একটা স্বরলিপি পাঠালেন। এটি ছিল আমি তাঁকে মিথটির যে কাঠামো বলেছিলাম তাকে অনুসরণ করে লেখা।

তবে সঙ্গীত ও ভাষার মধ্যে তুলনা অসম্ভব প্যাঁচালো একটা ব্যাপার। এর কারণ এদের মধ্যে দারুণ মিলের জায়গা যেমন আছে তেমনি আছে কিছু প্রবল পার্থক্য। সমসাময়িক ভাষাতাত্ত্বিকরা আমাদের বলছেন যে ভাষার ভিত্তি হচ্ছে ধ্বনিমূল নামের উপাদান। ধ্বনিমূল হল সেইসব ধ্বনি যেগুলোকে আমরা এক একটি অক্ষর দিয়ে ভুলভাবে উপস্থাপন করি। এসব ধ্বনিমূলের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, এগুলোর সমন্বয়ে আলাদা আলাদা অর্থবোধক ধ্বনি তৈরী হয়।। একই কথা বলা চলে সঙ্গীতের স্বর সম্পর্কেও । এ বি সি ডি ইত্যাদি সঙ্গীতের এক একটি স্বরের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই; এগুলো স্রেফ এক একটা স্বর।

এদের সমন্বয়ের ফলেই সঙ্গীত সম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে ভাষায় যেমন গোড়ার উপাদান ধ্বনিমূল, তেমনি সঙ্গীতেও এরকম গোড়ার উপাদান থাকতে পারে ফরাসীতে যাকে আমি বলছি 'সোনিম' (Soneme)। ইংরেজীতে একে 'টোনিম' (Toneme) বলা যেতে পারে। এটা একটা মিল।

কিন্তু ভাষার ব্যাপারে পরের ধাপে গেলে দেখা যাবে ধ্বনিমূলগুলো সমন্বিত হয়ে শব্দে পরিণত হচ্ছে ; শব্দগুলো আবার একসাথে হয়ে বাক্য গঠন করছে। সঙ্গীতে কিন্তু শব্দের কোনো কারবার নেই। সেখানো মৌলিক উপাদান স্বরগুলো সংযুক্ত হয় কিন্তু এর ফলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে 'বাক্য' – একটি সুরবদ্ধ অনুপ্রকাশ। ভাষার মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যায় – ধ্বনিমূল থেকে শব্দ হয়, শব্দ জুড়ে জুড়ে হয় বাক্য। যুক্তির দিক থেকে সঙ্গীতের স্বরের সাথে ধ্বনিমূলের তুলনা করা যায়। কিন্তু এখানে শব্দের স্বরটি অনুপস্থিত, স্বর থেকে সরাসরি বাক্যের স্তর চলে আসে।

আপনি মিথলজির সাথে সঙ্গীত ও ভাষার তুলনা করতে পারেন; তবে এখানে তফাৎ হল: মিথলজিতে কোনো ধ্বনিমূল নেই; শব্দ এর সবচেয়ে ক্ষুদ্র উপাদান। ভাষাকে যদি একটি পরিকাঠামো ধরি তবে এটি গড়ে ওঠে প্রথমত ধ্বনিমূল, দ্বিতীয়ত শব্দ, তৃতীয়ত বাক্য দিয়ে। সঙ্গীতে আপনি ধ্বনিমূল ও বাক্য সদৃশ উপাদান পাবেন তবে শব্দ সদৃশ কোনো উপাদান পাবেন না। মিথে আবার শব্দ ও বাক্য উপাদান আছে, কিন্তু নেই কোনো ধ্বনিমূল সদৃশ উপাদান। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই একটি করে উপাদান অনুপস্থিত।

ভাষা, মিথ ও সঙ্গীতের সম্পর্ক বুঝতে হলে ভাষাকে প্রস্থানবিন্দু ধরতে হবে। এর ফলে একদিকে সঙ্গীত এবং অন্যদিকে মিথলজি দুটোই যে ভাষা থেকে উৎপন্ন তা দেখনো যাবে। তবে ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়ে এরা ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখে যাত্রা করেছে। সঙ্গীত ভাষাতেই নিহিত শব্দের পরিপ্রেক্ষিতটিকে নিয়ে কাজ করেছে আর মিথলজিতে জোর পেয়েছে বোধ ও অর্থের পরিপ্রেক্ষিত যেটা আসলে ভাষার অন্তরেই নিহিত।

ভাষা যে পরস্পর অচ্ছেদ্য দু'টি উপাদান সমন্বয়ে গঠিত এ বিষয়ে আমাদের প্রথম সচেতন করেন ফার্দিনান্দ ডি সস্যুর। ধ্বনি ও অর্থ ভাষার সেই অবিচ্ছেদ্য দুই উপাদান। আমার বন্ধু রোমান জ্যাকবসন সম্প্রতি একটা ছোট্ট বই বের করেছেন যার নাম *Le Son et le Sens*, অর্থাৎ ভাষার দুই

অবিচ্ছেদ্য পিঠ। ধ্বনি আছে, ধ্বনির অর্থ আছে আর ধ্বনি ছাড়া অর্থের কোনো অস্তিত্ব নেই। সঙ্গীতে ধ্বনির গুরুত্ব বেশী আর মিথে গুরুত্ব পায় অর্থ।

"শৈশব থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতাম কম্পোজার হব বা নিদেনপক্ষে একজন অর্কেস্ট্রা লিডার। ছোট থাকতে একটি অপেরার জন্য খুব খেটেখুটে সঙ্গীত রচনা করেছিলাম, সেটা ছিল লিব্রেট্টো ধরনের সঙ্গীত। তাছাড়া সেটও করেছিলাম। কিন্তু এসব করার কোনো ক্ষমতা আমার আদৌ ছিল না কারণ এসবের জন্য অবশ্য দরকার এরকম কিছু একটা আমার মস্তিষ্কেই নেই। আমার যেটা মনে হয়, একমাত্র সঙ্গীত আর গণিত এ দু'টোর জন্য জিনগত কিছু ক্ষমতা থাকতে হয়। মনে আছে যুদ্ধের সময় যখন আমি ন্যুইয়র্কে শরণার্থী ছিলাম সে সময় ফরাসী কম্পোজার দারিয়ুস মিল্যুদ-এর সাথে একবার ডিনার খেয়েছিলাম। "ঠিক কখন বুঝতে পারলেন যে আপনি একজন কম্পোজার হতে চলেছেন?" জানতে চেয়েছিলাম আমি। তিনি বললেন একেবারে শৈশবে ঘুমিয়ে পড়ার আগে এক ধরনের সুর শুনতেন যার সাথে তাঁর ইতিমধ্যে শোনা সুরের কোনো মিল ছিল না। পরে তিনি আবিষ্কার করেন যে সেটাই ছিল তাঁর নিজস্ব সুর বা সঙ্গীত।

যখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে সঙ্গীত ও মিথলজি ভাষার গর্ভে জন্ম নেওয়া দুই সহোদরা পরবর্তীকালে যাদের গন্তব্য দু'দিকে বেঁকে গেছে – মিথগুলোতে যেভাবে বর্ণনা করা হয় আর কি, একটি চরিত্র যায় উত্তরে, আরেকটি দক্ষিণে এবং তাদের আর কখনো দেখা হয় না – তখন থেকেই ভেবেছি ধ্বনি দিয়ে যদি আমার দ্বারা রচনা সম্ভব না হয় তবে অর্থের সাহায্যে সেটা সম্ভব হতে পারে।

এখানে যে তুলনা আমি করেছি, আরেকবার জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমি যদ্দুর বুঝি সেটা কেবলমাত্র সাম্প্রতিক শতকগুলোতে সঙ্গীত যেভাবে বিকশিত হয়েছে সেখানেই খাটে। কিন্তু ইদানিং আমরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি যেটা অনেকটা সাহিত্যের ধারা হিসাবে মিথ বিলুপ্ত হয়ে উপন্যাস যখন তার জায়গা নিল তার মত। আমরা এখন উপন্যাস অদৃশ্য হতে দেখছি। সতের শতকে মিথলজির কাঠামো ও ভূমিকার জায়গা যেভাবে সঙ্গীত নিয়েছিল, সেই প্রক্রিয়াই আবার দেখতে পাচ্ছি যখন সাহিত্যের ধারা হিসাবে উপন্যাসের বিলুপ্তি ঘটছে আর তার জায়গা নিচ্ছে তথাকথিত সিরিয়াল মিউজিক।

[প্রবন্ধের ইংরেজী নাম: Myth and Music]

নোট

১. ফ্রেসকোবাল্ডি (Girolamo Frescobaldi) – গিরোলামো ফ্রেসকোবাল্ডি (১৫৮৩-১৬৪৩) ছিলেন ইতালীয় কম্পোজার ও অর্গানবাদক। তিনি সতের শতকের প্রথমার্ধের বিখ্যাত কিবোর্ডবাদক স্যুইলিঙ্কের সাথে কাজ করেন। ফ্রেসকোবাল্ডির প্রথম দিকের কাজে রেনেসাঁর শেষের দিকে উত্তর ও দক্ষিণ ইতালিতে বিকশিত কিবোর্ড বাজনার বিভিন্ন ঘরানার একটি সারাংশসূচক রূপ মেলে। তাঁর শেষের দিকের কাজে (১৬১৫-৩০) বারোক স্টাইলের প্রথম যুগের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক দিকগুলোর স্বাদ পাওয়া যায়।

২. বাখ (Johann Sebastian Bakh)—ইয়োহান সেবাস্টিয়ান বাখ (১৬৮৫-১৭৫০) জার্মান কম্পোজার। বাখ ও হ্যান্ডেল (১৬৮৫-১৭৫৯) সতের শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের ধ্রুপদী সঙ্গীতে একচ্ছত্র রাজত্ব করেন।

৩. মোজার্ট (Wolfgang Amadeus Mozart)—ওলফগ্যাঙ আমাদিউস মোজার্ট (১৭৫৬-৯১) জার্মান কম্পোজার। ইউরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের মহান প্রতিভা। তিনি সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রধান কম্পোজার।

৪. বিথোভেন (Ludwig van Beethoven)—লুদউইগ ভ্যান বিথোভেন (১৭৭০-১৮২৭) ইউরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের আরেক বিরাট মাপের প্রতিভা। তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকে তিনটি মূল ভাগে ভাগ করা হয়। হেইডেন ও মোজার্টের সার্থক উত্তরসূরী এই কম্পোজার শুদ্ধতম অনুভূতি ও গভীরতম ভাবনার নির্মাণ করেছিলেন নিজের সঙ্গীতে। বিথোভেনের সঙ্গীতে যেমন তাঁর পূর্বসূরীদের নির্মিত ঐতিহ্যের ছাপ মেলে তেমনি এতে তাঁর পরের ধারা উনবিংশ শতকের রোমান্টিক ঘরানার ছাপও পাওয়া যায়। বিথোভেন পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর আসন

পাকা করেন 'এরোইকা' (থার্ড সিম্ফনি) রচনা করে। এরপর তিনি আরো নয়টি সিম্ফনি রচনা করেন। পাশ্চত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের ইতিহাসে বিথোভেনের সঙ্গীত চিন্তা ও লেখার মূল্য অপরিসীম।

৫. ওয়াগনার (Richard Wagner) -রিচার্ড ওয়াগনার (১৮১৩-৮৩) পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের সম্ভবত সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর পূজারীদের সংখ্যা যেমন অসংখ্য তাঁর প্রবল সমালোচকের সংখ্যাও কম না। অপেরার ক্ষেত্রে প্রচলিত ফর্ম ভেঙে তিনি একে নতুন রূপ দেন। ওয়াগনার মিউজিক-ড্রামাকে সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্রকলার একটি সমন্বিত রূপ হিসাবে দেখতেন। *দ্য রিং অব দ্য নিবেলুঙ* (*The Ring of the Nibelung*) অপেরার মাধ্যমে তিনি তাঁর অভীষ্টে পৌঁছান। চোদ্দ ঘণ্টাব্যাপী এই অপেরা চারটি ভাগে বিভক্ত তাই একে টেট্রালজি বলা হয়। ওয়াগনারের আগে কেউ অপেরায় মানুষের অস্তিত্বের সবকটি রং এভাবে ধরতে চেষ্টা করেননি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইতিহাসে এই রচনাটি সব যুগে সব কালে সঙ্গীত রচয়িতা, দার্শনিক ও লেখকদের বিস্ময় ও বিতর্কের খোরাক যোগাবে।

6. Score (Musical Score, orchestral score etc.) – Copy of any music written in several parts.
7. Sonata – Term to denote a musical form and a type of composition. In sonata form a composition is divided into exposition, development and recapitulation. A Sonata is a piece, usually for one or more players following that form.
8. Symphony – Orchestral work of serious purpose usually in four movements, ocassionally given name (e.g. Beethoven's "Choral" Symphony).
9. Toccata – Instrumental piece usually needing rapid, brilliant execution.
10. Rondo – Form of music in which one section keeps recurring.

11. Serial Music – The early post World War II saw a renewed interest in " twelve-note techniques" Otherwise known as " Serialism". Composers like Stravinsky and Dallapicolla (1904-75), who had shunned serialism in earlier years, began to experiment and absorb serial techniques into their musical style. This period also saw the emergence of a new generation of composers, keen to jettison the past and begin anew. Serialism was favored tool, its revival stemming from Paris, where Webern's pupil Rene Leibwitz was teaching and the USA where Schoenberg had fled from Nazi Germany.

    The American Milton Babbit (b.1916) was much concerned with codifying serial techniques. His younger European contemporaries Pierre Boulez (b.1925) and Karlheinz Stockhausen (b.1928) sought to increase the number of musical elements to be controlled by a predetermined method.

[Source for the notes: Pears Cyclopaedia, Ed. Christopher Cook, 1986]

ক্লদ লেভি-স্ত্রসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ক্লদ লেভি-স্ত্রস ১৯০৮ সালের ২৮ নভেম্বর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে জন্ম নেন। ফরাসী এই নৃতত্ত্ববিদ কাঠামোবাদের প্রধান প্রবক্তা। কাঠামোবাদ শব্দটি সাধারণতঃ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনা বা শৃঙ্খলা যেমন আত্মীয়তা, মিথকাঠামো ইত্যাদি ব্যাখ্যা এবং এসব শৃঙ্খলার বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়। কাটামোবাদ বিংশ শতকের সামাজিক বিজ্ঞানকে যে প্রভাবিত করেছে শুধু তাই না, দর্শনপাঠ, তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য ও সিনেমার ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব প্যারিসে দর্শন ও আইনশাস্ত্র (১৯২৭-৩২) পড়ার পর লেভি-স্ত্রস একটি মাধ্যমিক স্কুলে পড়াতে শুরু করেন। তিনি এসময় জাঁ পল সার্ত্রকে ঘিরে যে বুদ্ধিজীবী বলয় গড়ে উঠেছিল তাতে যোগ দেন। ইউনিভার্সিটি অব সাও পাওলোতে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক থাকার সময় (১৯৩৪-৩৭) লেভি-স্ত্রস ব্রাজিলের রেড ইন্ডিয়ানদের ওপর মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করেন। তিনি নিউইয়র্ক সিটির নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ-এ ভিজিটিং প্রসেসর ছিলেন (১৯৪১-৪৫)। এখানে তিনি ভাষাতাত্ত্বিক রোমান জ্যাকবসনের কাজ দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯৫০-৭৪ পর্যন্ত তিনি ইউনিভর্সিটি অব প্যারিসের Ecole Pratique des Hautes Etudes-এর ডিরেক্টর অব স্টাডিজ ছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি কলেজ ডি ফ্রান্সে সোশ্যাল এনথ্রপলজির চেয়ারম্যান হন।

১৯৪৯-এ লেভি-স্ত্রস তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রকাশ করেনঃ *এলিমেন্টারি স্ট্রাকচারস অব কিনশিপ* (*Elementary Structures of Kinship*; French: Les Structures elementaires de le parente)। *'আ ওয়ার্ল্ড অন দ্য ওয়েভ'* (*A World on the Wave* Fr: *Tristes*

Tropiques) তাঁকে ব্যাপক পরিচিত ও জনপ্রিয়তা এনে দেয়। 'স্ট্রাকচারাল এনথ্রপলজি' (Structural Anthropolgy, Fr: Anthropology Structurale) তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রকাশনার একটি। এর ইংরেজী সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১সালে। তাঁর পরবর্তী প্রকাশনা *'দ্য স্যাভেজ মাইন্ড'* (*The Savage Mind*; Fr: *Le pensee Savage*) ও *'টোটেমিজ্‌ম'* (*Totemism*, Fr: Le *Totemisme aujourd'hui*)।

চার খণ্ডে তাঁর বিশাল রচনা *'মিথোলজিক্স'* প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯৬৪ থেকে। এর প্রথম খণ্ড *'দ্য র এন্ড দ্য কুকড'* (*The Raw and the Cooked*; Fr: *Le Cru et le Cuit*)। দ্বিতীয় খণ্ড *'ফ্রম হানি টু অ্যাশেজ'* (*From Honey to Ashes*; Fr: *Du miel aux cendres*); তৃতীয় খণ্ড *'দি অরিজিন অব টেব্‌ল ম্যানার্‌স'* (*The Origin of Table Manners*; Fr : *L'Origine des manieres de table*) এবং চতুর্থ খণ্ড *'দ্য নেকেড ম্যান'* (The Naked Man ; Fr: *L'Homme nu*)

মুখোশ সম্পর্কে তাঁর বই *'দ্য ওয়ে অব দ্য মাস্কস'* (*The Way of the Masks*; Fr: *La Voiedes masques*) আমেরিকার উত্তর উপকূলের অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের শিল্প, ধর্ম ও মিথলজির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে রচিত। ১৯৮৩ সালে তিনি *'দ্য ভিট ফ্রম অ্যাফার'* (*The View from Afar*; Fr: *Le Regard eloigne*) প্রকাশ করেন।

পৃথিবীর বহু বিচিত্র সংস্কৃতি যেগুলো নিজস্ব এক একটি ব্যবস্থাপনা ব শৃঙ্খলার মধ্যে বিকশিত হয়েছে তাদের গোড়ার উপাদানগুলোকে খুঁজে বের করতে লেভি-স্ত্রস কাঠামোবাদের তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া তিনি চেষ্টা করেছিলেন এসব ব্যবস্থাপনা বা সিস্টেমের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রগুলো আবিস্কার ও ব্যাখ্যা করতে। সংস্কৃতি লেভি-স্ত্রসের দৃষ্টিতে ছিল যোগাযোগের পদ্ধতি বিশেষ এবং এসব পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে তিনি কাঠামোবাদী ভাষাতত্ত্ব, ইনফরমেশন থিয়োরি ও সাইবারনেটিক্সের ওপর ভিত্তি করে অনেকগুলো মডেল তৈরি করেছিলেন।

উৎস : The New Encyclopaedia Britannica, 1995 Encyclopaedia Britannica Inc.

❑